আত্ম-গঠন

বা

ব্রহ্মচর্য্য-প্রসঙ্গ

অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর
শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব প্রণীত

পঞ্চম-সংস্করণ

—নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ—

—ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ—

অযাচক আশ্রম

স্বরূপানন্দ ষ্ট্রীট, বারাণসী ।

মূল্য ২·০০ টাকা] [মাশুলাদি স্বতন্ত্র ।

মুদ্রণ-সংখ্যা ৩০০০
প্রকাশক—শ্রীস্নেহময় ব্রহ্মচারী
অযাচক আশ্রম
ডি ৪৬।১৯বি, স্বরূপানন্দ ষ্ট্রীট, বারাণসী-১
[1976]
পুস্তকসমূহের প্রাপ্তিস্থান ঃ—
অযাচক আশ্রম
ডি ৪৬/১৯বি, স্বরূপানন্দ ষ্ট্রীট, বারাণসী-১
(উত্তর প্রদেশ)
কলিকাতার নিম্নলিখিত স্থানসমূহে ঃ—
১। গুরুধাম, পি ২৩৮, সি, আই, টি, রোড,
কাঁকুড়গাছি, কলিকাতা—৫৪
২। মহেশ লাইব্রেরী, ২।১ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-১২
৩। দক্ষিণেশ্বর বুকষ্টল, কালীবাড়ী, দক্ষিণেশ্বর,
কলিকাতা-৩৫

প্রিণ্টার ঃ—শ্রীস্নেহময় ব্রহ্মচারী
অযাচক আশ্রম প্রিণ্টিং ওয়ার্কস
ডি৪৬।১৯বি, স্বরূপানন্দ ষ্ট্রীট, বারাণসী-১

নিবেদন

(১)

"আত্মগঠন বা ব্রহ্মচর্য্য-প্রসঙ্গ" নামক গ্রন্থের কিয়দংশ কতিপয় বৎসর পূর্ব্বে ময়মনসিংহের অধুনালুপ্ত একটি সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। কিন্তু ইহার রচনা হয় তাহারও বহু পূর্ব্বে, ১৩২৯ সালে। অযাচক বৃত্তিধারী আশ্রম এই অমূল্য গ্রন্থ প্রকাশের জন্য দ্বাদশ বর্ষকাল চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। যে গ্রন্থের হস্তলিখিত অনুলিপি প্রচারের দ্বারাই বাংলার অসংখ্য যুবকের আত্মগঠনের সহায়তা হইয়াছে, আশা করি, সেই গ্রন্থ মুদ্রণের ফলে তদপেক্ষা অধিকতর সংখ্যক তরুণের আত্মগঠনের সহায়তা করা হইবে।

আজই মাত্র পূজ্যপাদ গ্রন্থকার জন-সমক্ষে দেশপূজ্য লোকগুরু এবং যশস্বী বাগ্মী রূপে প্রকটিত হইয়াছেন। অবস্থার দাবী তাঁহাকে প্রকাশ্য কর্ম্মক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। বক্তৃত্বের অসামান্য সামর্থ্যের অধীশ্বর হইয়াও যিনি কায়মনোবাক্যে প্রকাশ্য বক্তৃতামঞ্চ সযত্নে পরিহার করিয়া বৎসরের পর বৎসর তরুণের জীবন-গঠনে তাঁহার সুদুর্ল্লভ সেবা প্রদান করিয়াছেন, তিনি যে-সময়ে স্বেচ্ছায় আত্মগোপন করিয়া সাধারণ মানুষদের মধ্যে নিতান্ত সাধারণতার আবরণে স্বকীয় অসামান্য ব্যক্তিত্বকে আচ্ছাদিত করিয়া মিশিয়া রহিয়াছেন, তখন যে সকল তরুণ তাঁহার উপদেশের আলোকে জীবনের অভ্রান্ত পন্থার অন্বেষণ করিতেন, তাঁহাদের প্রায় সকলেরই সহিত এই শক্তিধর মহাপুরুষের পরিচয় হইত পত্রে, ভাবের বিনিময় হইত লেখনী-সাহায্যে।—এই গ্রন্থ সেই সময়ের রচনা।

বলিতে গেলে, পত্র লিখিয়াই যিনি জীবন কাটাইয়া দিলেন, আজও যাঁহাকে অফুরন্ত কর্ম্মের বিরল অবসরে অফুরন্ত ভাবে দৈনিক প্রায়

চারি পাঁচ ঘণ্টা ব্যথিত চিত্তে সান্ত্বনা ও হতাশ প্রাণে আশা-সঞ্জীবন প্রদানের জন্য কেবল পত্রই লিখিতে হয়, রেলে, ষ্টীমারে, নৌযানে ভ্রমণের কালে যাঁহাকে অসংখ্য পত্রের উত্তর প্রদানেই ব্যস্ত থাকিতে হয়, পরিচিত-অপরিচিত নির্ব্বিশেষে, বালক-বৃদ্ধ নির্ব্বিশেষে, স্ত্রী-পুরুষ নির্ব্বিশেষে প্রত্যেক অভ্যুদয়কামী চিত্তে উৎসাহের ও প্রেরণার সঞ্চারণা যাঁহার কর্ম্মজীবনের প্রধানতম তালিকা, এই অমূল্য গ্রন্থ তাঁহার বজ্রবিদ্যুন্ময়ী লেখনী-নিঃসৃত কতকগুলি ব্যক্তিগত পত্রেরই সমষ্টি মাত্র। ১৩২৯ সালে কুমিল্লান্তর্গত কমলাসাগর (কসবা) উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের একটি কৃতী ছাত্রের নিকটে দুই চারিদিন ব্যবধানে ধারাবাহিক ভাবে তিনি যে পত্রধারা বর্ষণ করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে দৈব-দুর্ব্বিপাক অতিক্রম করিয়া সে কয়টির অস্তিত্ব অক্ষুণ্ণ ছিল, তাহারাই বর্ত্তমান গ্রন্থের জন্মদান করিয়াছে। আকস্মিক ঝটিকার উৎপাতে উক্ত ছাত্রের গৃহ হইতে কতকগুলি মূল্যবান্ পত্র উৎক্ষিপ্ত ও বিনষ্ট হয়। সেই পত্রগুলি আর পাওয়া যায় নাই। দুর্ভাগ্যের বিষয়, কোনও পত্রেরই অনুলিপি রক্ষিত ছিল না। ঝটিকান্তে দেখা গেল, প্রথম দিকের তিনখানা পত্র এবং শেষ দিকের আট দশখানা পত্রের চিহ্ন-মাত্রও নাই। যে ধ্বংসাবশেষ রহিল, তাহারই ব্যক্তিগত অংশগুলি বাদ দিয়া এবং দুই এক স্থলে আবশ্যকীয় সংযোজনা করিয়া ১৩৩১ সালে প্রবন্ধ-পরিচ্ছেদাকারে এই গ্রন্থ সঙ্কলিত হয়।—আশা করি, এই তপঃপূত বীর্য্যবাণী ঘরে ঘরে মনুষ্যত্বের সাধনাকে সুলভ এবং সহজ করিবে।

প্রসঙ্গক্রমে গ্রন্থকারের তরুণ জীবনের দুই একটি কথা এক্ষেত্রে বর্ণন করিলে সম্ভবতঃ নিতান্ত অনুচিত হইবে না। যে বয়সের একটি তরুণের

নিকটে গ্রন্থকার এই গ্রন্থের বাণী-সমূহ পত্রাকারে প্রেরণ করিয়াছিলেন, প্রায় সেই বয়সে গ্রন্থকার স্বয়ং কি ভাবে আত্ম-গঠন-পরায়ণ হইয়াছিলেন, তাহার কিঞ্চিৎ বিবৃতি স্বভাবতই নিবেদন-পৃষ্ঠে একটু আসনের দাবী করিতেছে। কারণ, পূজনীয় গ্রন্থকার এই গ্রন্থ তাঁহার বাল্যকালের সাথী পরলোকগত ৺ননীলাল কুণ্ডের নামে উৎসর্গ করিয়াছেন।

ননীলাল যখন বালক, গ্রন্থকার তখনও বালক। দুইজনে প্রায় সমবয়সী, দুইজনেই প্রায় সমরুচি। দুইজনেই তরুণ কৈশোরে ভগবানের নাম জপের প্রতি রুচিমান্ হন এবং দুইজনেই নাম জপের মধ্য নিয়া নিজ নিজ বিকাশোন্মুখ বৃত্তিসমূহকে উন্মেষ প্রদানের চেষ্টা করেন। জপে, ধ্যানে, কীর্ত্তনে, কথকতা-শ্রবণে ননীলাল আর শ্রীমৎ স্বরূপানন্দ হরিহরাত্মা, অভেদ মূর্ত্তি, নিত্য সাথী। গ্রন্থকারের পিতামহ চাঁদপুরের প্রধানতম উকিল এবং ভক্তশ্রেষ্ঠ হরিহর গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় ঠাকুর-ঘরের সমক্ষে আমলকী বৃক্ষের ছায়ায় একটি মনোরম তুলসী-মঞ্চ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। দুইবন্ধু তারই পাদমূলে বসিয়া করতাল বাজাইয়া হরিনাম কীর্ত্তন করিতেন, কখনো বা ধ্যানস্তিমিত নয়নে নাম-জপ করিতেন।

ইহা হইতেছে, তাঁহাদের দশ হইতে তেরো বৎসর বয়সের কথা। আর এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট বিষয়সমূহ শ্রীমৎ স্বামীজী মহারাজ লিপিবদ্ধ করেন পনের বৎসর বয়স্ক একজন বালককে। বাল্যে যিনি নিজের জীবন-গঠনে বিন্দুমাত্র সুযোগকে উপেক্ষা করেন নাই, অণুমাত্র আলস্যকেও প্রশ্রয় দেন নাই, তাঁর লিখিত গ্রন্থ বলিয়াই দ্বাদশ বর্ষকাল এই গ্রন্থ অমুদ্রিত অবস্থায় থাকিয়াও হাতের লেখায় প্রচারিত হইয়াই কয়েক সহস্র যুবকের জীবন-গঠনে সাহায্য করিয়াছে। ইতি—

১লা মাঘ, ১৩৪১

"সংযম সাধন আর
অখণ্ড-চরিত্র-বল
নিত্য-সুখ, নিত্যানন্দ
বৰ্দ্ধিত করে কেবল।

—স্বরূপানন্দ

অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর
শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব

ওঁ

আত্ম-গঠন

বা
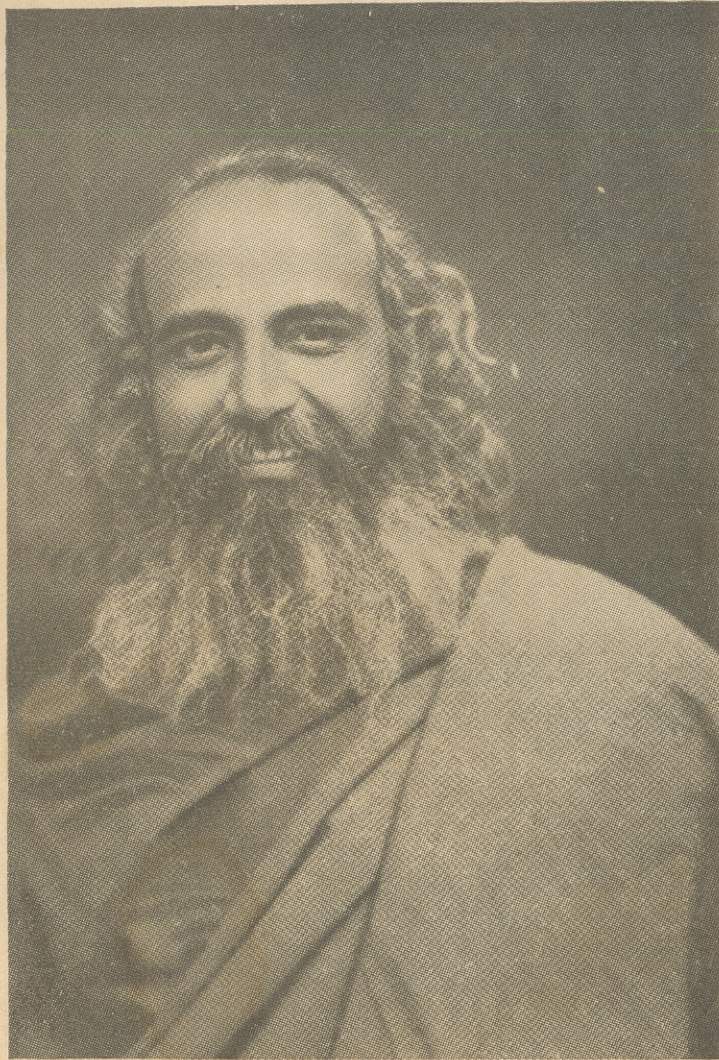
ব্রহ্মচর্য্য-প্রসঙ্গ

প্রথম পরিচ্ছেদ

ব্রহ্মচারী কে?

যাহারা ব্রহ্মচর্য্যের সাধন করিতে চাহিবে, তাহাদিগকে প্রতি মুহূর্ত্তে মনে জাগরূক রাখিতে হইবে, কঠোর কৃচ্ছ্রতায় যে দৈহিক সামর্থ্য সঞ্চিত হইয়াছে, অশেষ অধ্যবসায়ে যে মানস-সমৃদ্ধির মন্দির-চূড়া গঠিত হইতেছে, তাহা আমাদের নহে, সমগ্র জগতের। আমাদের তেজ, বীর্য্য, পৌরুষ, আমাদের মেধা, মনীষা, প্রতিভা, প্রত্যেককেই আমাদের স্বার্থের সীমাকে লঙ্ঘন করিয়া পরার্থের প্রশস্ত প্রান্তরে আসিয়া পড়া চাই। আমাদের জ্ঞান, বুদ্ধি ও কর্ম্মপ্রেরণা সর্ব্বতোভাবে পরের জন্য সমর্পিত এবং নিয়োজিত থাকা চাই। নতুবা যে ব্রহ্মচর্য্যের অভ্যাস করিয়া আমাদের দেহে ও মনে শক্তির ফল্গু ও প্রকাশ্য উৎস উৎসারিত হইতেছে, তাহার অস্তিত্ব মহিমাহীন এবং ব্যর্থ হইয়া যাইবে।

ব্রহ্মচারী কে? না, যিনি নিত্যকাল ব্রহ্মতত্ত্বে নির্ভুলভাবে বিচরণ করেন। শাশ্বত, সনাতন, সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বপ্রাণ ব্রহ্ম-সাগরে ডুবিয়া থাকিয়া যিনি নিজের জন্ম-কর্ম্ম সার্থক করিতে পারেন, তিনিই ব্রহ্মচারী।

কিন্তু ব্রহ্ম কি?—তাহা কেহ বলিতে পারে না। মানুষের মত মানুষ হইলে বুঝিতে পারে, বুঝাইতে পারে না। একনিষ্ঠ সাধক হইলে দেখিতে পারে, দেখাইতে পারে না; অনন্য-চিত্ত প্রার্থী হইলে অন্তরের গোপন নিগূঢ়ে তাঁহাকে লাভ করিতে পারে, কিন্তু তাঁহার স্বরূপ ব্যাখ্যা করিতে পারে না। এই জন্যই তাঁহাকে লইয়া শতজনে শত কথা বলিয়াছেন, আংশিক সত্যে আংশিক অসত্যের মিশ্রণ দিয়া নিজ নিজ মনোভিমতানুযায়ী বিবৃতি দিয়াছেন এবং সর্ব্বত্র পরস্পরে প্রতিপক্ষতার সৃষ্টি করিয়া পরবর্ত্তী সংস্কারানুগ অনুবর্ত্তীর জন্য ধর্ম্মান্ধতা, গোঁড়ামি, পরমতাসহিষ্ণুতার পুঁজী নিজেদের সম্যক্ অজ্ঞাতসারে রাখিয়া গিয়াছেন। গোঁড়ামির সেই সব উত্তরাধিকার পাইয়া জগতের লোক বহুবার বহু বিপ্লব, ধ্বংস, প্লাবন ও প্রলয় আনিয়াছে।

তাই, আমি সেই ব্যক্তাব্যক্ত, সূক্ষ্মাসূক্ষ্ম, চরাচর ব্রহ্মের ব্যাখ্যা করিতে সাহসী নহি। পরমত-খণ্ডনের আকাঙ্ক্ষা না রাখিয়া, তাঁহাকে যাহা বলিতে যখন আমার ভাল লাগে, তাহাই আমি তখন তাঁহাকে বলিব,—তাঁর ব্যাখ্যা করিব না। পদ্ধতি-বদ্ধ যুক্তিতর্কের গণ্ডী বাঁধিয়া একটা নির্দ্দিষ্ট দার্শনিক কাঠামোর

মধ্যে তাঁহাকে আবদ্ধ করিব না। তিনি যখন আমার কাছে ব্যক্ত হইবেন, তখন আমি তাঁহার ব্যক্তিত্বের কথা বলিব; যখন তিনি অব্যক্ত রহিবেন, তখন তাঁহাকে অন্তরায়িত জানিয়া অন্তরেই রাখিব। যখন তিনি স্থূল হইয়া আমার স্থূলদৃষ্টির অনুরূপ রূপ ধরিয়া অবতরণ করিবেন, তখন সূক্ষ্ম বিচারের ধার আমি ধারিব না; যখন সহজ স্বরূপে আসিবেন, তখন কঠোর কঠিন পথে চলিব না। যখন তিনি সচল বিগ্রহ ধরিয়া আসিবেন, তখন তাঁর নূপুর-শিঞ্জিত চারু-চরণ ভঙ্গীর চিত্রই আমি আঁকিব; আবার যখন তিনি অচল আনন্দে নিবিড় ছন্দে রহিবেন,—তখন আমার চঞ্চল-কলকণ্ঠ নিরুদ্ধ রাখিব। কখন কি দেখিলাম, কখন কি বুঝিলাম, আর কখন কি কহিলাম, তাহার আপাত-প্রতীয়মান বিরোধিতার সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা পাইয়া যুক্তির জের টানিব না। আমি তাঁহাকে যাহা বলিয়া বুঝিলাম, তুমিও যদি তাঁহাকে তাহাই বোঝ, অতিশয় আহ্লাদের কথা; কিন্তু যদি তুমি নিজের উপলব্ধির প্রত্যক্ষ বিচারে আমার বুঝ্‌কে ভ্রান্ত বলিয়া ঠেলিয়া ফেলিতে চাহ, তাহাতেও আমি প্রতিবাদ করিব না।

আমি তাঁহাকেই ব্রহ্ম বুঝি, যিনি আমার প্রিয়তম। যাঁহাকে ভালবাসিতে আমার ভাল লাগে, যাঁহার কথা কহিতে আমি সুখ পাই, যাঁহার বিষয় ভাবিতে আবেশ আসে, যাঁহারে চাহিলেই আমি মাতোয়ারা, আর যাঁহারে পাইলে আমি-

আপন-হারা, তিনিই আমার ব্রহ্ম। যাঁহাকে "এ' দেহ দিয়াছি" ভাবিতে রোমাঞ্চে পুলকিত হই, "এ' মন সঁপিয়াছি" ভাবিতে হরষে বিভোর হই,—যাঁহাকে "আপনার আপন, জীবনের জীবন" বলিয়া ডাকিয়াও আরও আপন বলিয়া ডাকিতে সাধ যায়, যাঁহাকে সর্ব্বস্ব দিয়াও আরও দিতে ইচ্ছা করে, তিনিই আমার ব্রহ্ম। যাঁহার কথা মনে পড়িলে জগতের সুখরাশি তুচ্ছ মনে হয়, যাঁহার উপরে নয়ন পড়িলে শয়নেও সে নিমীলিত হয় না, যাঁহাকে ক্ষণে ভালবাসি প্রসূতির মত, ক্ষণে ভালবাসি সন্তানের মত, যাঁহাকে কখনও বা আকাশের উদারতায় দেখিয়া বিবশ হই, কখনও বা ইন্দ্রধনুর সপ্তরাগে রঞ্জিত-তনু দেখিয়া আকুল অধীর হই তিনিই আমার ব্রহ্ম। যাঁহাকে সুখে পাইলে সুখী হই, যাঁহাকে দুঃখে পাইলে সুখী হই, যাঁহার আলিঙ্গনে হৃৎপিণ্ডে কণ্টকাগ্র বিঁধিলে কাতর হই না, যাঁহার আদরের নিপীড়নে সর্ব্বাঙ্গ-গ্রন্থি সন্ধিচ্যুত হইলে ব্যথিত হই না, আমি যাহাকে চাহি, আবার যিনি আমাকে চাহেন,—তিনিই আমার ব্রহ্ম। যিনি আমাকে চাহিবার কালে আমার রূপ-গুণ বাছেন না, জাতিকুল খোঁজেন না, আবার যাঁহাকে চাহিতে গিয়া নিজের খর্ব্বা-খর্ব্বতা, সামর্থ্য-অসামর্থ্য, দোষগুণ, কুলশীল, মানাপমান আমি আপনিই ভুলিয়া যাই,—তিনিই আমার ব্রহ্ম।

কিন্তু কে আমার প্রিয়তম, তাহা কি জান? যাঁহাকে জগতের সকল আশ্রয়দাতা "দূর-দূর" করিয়া তাড়াইয়া দিয়াছে

বিশাল বটপাদপ যাহা হইতে তার ছায়া সরাইয়া নিয়াছে, আকাশের জলদজাল যাহার কাছ হইতে বারিবর্ষণ প্রতিসংহার করিয়াছে, মলয়বায়ু যাহার অঙ্গস্পর্শ পরিত্যাগ করিয়াছে, আমার এ পোড়া-প্রাণ যে তাহাকেই ভালবাসিতে ভালবাসে! যাহারা নিরাশায় নির্ব্বাক্ হইয়াছে, নিপীড়নে নিরস্ত হইয়াছে, বাঞ্ছিতে বঞ্চিত হইয়াছে, গঞ্জনায় লাঞ্ছিত হইয়াছে, তাহাদেরই করুণ কথা যে আমার মুখজোড়া বুকভরা! যাহারা অবসাদে অমরতার আস্বাদন ভুলিয়াছে, অলসতায় আত্মশক্তির অপলাপ করিয়াছে, অপচয়ে অক্ষম হইয়াছে, অনৃতে অন্তঃসার হারাইয়াছে, আমার প্রাণমন যে তাহাদেরই ভাবনা ভাবিতে চাহে! কোন্ বিদ্যুৎ-স্পর্শে তাহাদের অবসাদ ঘুচিবে, কোন্ সঞ্জীবন-মন্ত্রে তাহাদের মধ্যে অমর জীবন জাগিয়া উঠিবে, কোন্ কর্ম্মের আবাহন তাহাদের আলস্য-নিথর অন্তরাত্মা দলিত-মথিত করিয়া আত্মস্মৃতি এবং আত্মশক্তির ঘুম ভাঙ্গাইবে, কোন্ জীবনীয় রসায়নে তাহাদের অপচয়ের পূরণ করিতে হইবে এবং কোন্ মহিমময়ী উচ্চাকাঙ্ক্ষা তাহাদের ভবিষ্যৎ অপব্যয় রুদ্ধ করিয়া, তেজ, বীর্য্য, শক্তি, সামর্থ্য উপচিত করিয়া পরপদলেহনী মনোবৃত্তির উচ্ছেদ সাধন করিবে, কোন্ সত্যের জ্যোতির্ম্ময় প্রতিভায় তাহাদের সকল অসত্য বন্যার জলে ভাসিয়া যাইবে, এ ভাবনায় বিভোর রহিতেই আমি চাহি। ধর্ম্মে যাহাদের শ্রদ্ধা টুটিয়াছে, জ্ঞানে যাহাদের অবজ্ঞা আসিয়াছে, প্রেমে

যাহারা বিদ্বেষ করিয়াছে, তাহাদের সকল অশ্রদ্ধা, অবজ্ঞা, অপ্রেম স্নেহপরশে মুছিয়া দিয়া যেদিন তাহাদিগকে বুকের মাঝে আমি পাইব, সেদিনই ত' আমি প্রকৃত আপন-হারা হইতে পারিব বলিয়া জানি। যাহারা উঠিতে পারিয়াও উঠিতে চাহে নাই, আর যাহারা জাগিতে চাহিয়াও জাগিতে পারে নাই, তাহাদেরই তরে দেহ-মন সমর্পণ করিয়াই ত' আমি আমার আত্মার চরম চরিতার্থতা লাভ করি। ইহারাই ত' আমার মুখপানে চাহিয়া আছে, করুণ-মিনতি-ভরা মৌন বেদনা আতুর আগ্রহে বারংবার আমারই কাছে পাঠাইতেছে, লালায়িত আবেগে আমারই জন্য অপেক্ষা করিতেছে!

—ইহারাই আমার ব্রহ্ম,—ইহারাই আমার ঈশ্বর, ইহারাই আমার সর্ব্বদেবদেব বিশ্বনাথ। ইহারাই আমাকে নির্ভুলভাবে চাহিয়াছে, তাই আমি ইহাদের, ইহারা আমার। আর, ইহা-দেরই তত্ত্বে যিনি নিত্যকাল বিচরণ করেন, আমার মতে তিনিই ব্রহ্মচারী। এই দুঃস্থ, দুর্গত, দুর্ব্বল, দুর্ভগ অনন্তকোটির দুর্দ্দৈব দূরীভূত করিতে যিনি দুশ্চর দৃঢ়তায় জীবনের দুর্ম্মূল্য দান দিয়াছেন, আমি বলিব, তিনি যথার্থ ব্রহ্মচর্য্যাভ্যাসী। ইহাদের দুর্নীত জীবনের দুর্নিরীক্ষ্য অন্ধকারে পবিত্রতার জ্যোৎস্না ফুটাইতে যিনি দুঃস্বপ্ন দেখিয়া ফিরিয়া আসেন নাই, দুঃসাধ্য ভাবিয়া হতাশ হন নাই, দারিদ্র্য-দহনে কাতর হন নাই, দুর-দৃষ্টের দিগন্তপ্রসারী বাধার নিকটে নতশির হইয়া দাসত্ব

স্বীকার করেন নাই, তেমন স্বাধীন-চিত্ত, স্ববশ, স্বভাবপ্রতিষ্ঠ, নির্ভীক নিরলস পুরুষই যথার্থ ব্রহ্মচারী।

হে ধীমান্! আজ তুমি হৃদয়ে সাহস সঞ্চার কর, বাহুতে বল সঞ্চার কর, তোমার মস্তিষ্কে সুপ্রসন্ন মেধা সঞ্জাত কর। জগতের নিরপেক্ষ কল্যাণে তোমাকে নির্ম্মদ, নির্ভয়, নির্ব্বিকার হইতে হইবে। জাতি-পুঞ্জের কলহ-কোলাহলের অসন্তোষ নাশ করিতে তোমাকে অটুট আনন্দে আত্মদান করিতে হইবে। দৈন্য-দলিত, দাসত্ব-পীড়িত, দুঃখ-মথিতের অসন্তোষ-ভারপুঞ্জ তোমারই সবল বাহুযুগলের আত্ম-প্রতিষ্ঠ ক্ষমতায় নামাইতে হইবে। বীরশূন্যা ভারতের বুকে আজ তুমি নিজেকেই বীর-কুঞ্জর বলিয়া জান, জননীকে বহুদিন পরে বীর-প্রসবিনী বলিয়া গৌরব করিবার অবসর দাও; ভ্রাতৃ-শ্লাঘায় দেশব্যাপী সকল ভ্রাতা-ভগিনীর মুখমণ্ডল হর্ষোজ্জ্বল হইবার সুযোগ দাও। ভুলিও না আজ, বীরত্ব আর বীরত্বের অভিনয় এক নহে। ব্রহ্মচর্য্য আর ব্রহ্মচর্য্যের অভিনয় এক নহে। জগৎ-কল্যাণ-তরে ঋষিমস্তিষ্ক হইতে যে অপূর্ব্ব জীবন-গঠনোপায় প্রসূত হইয়াছিল, আজ তাহার অভিনয় করিয়া তৃপ্ত থাকিলে, আত্মপ্রতারণা করিলে, চলিবে না। আজ সত্য সত্যই বুঝিতে হইবে,—কোন-প্রকারে কলে-কৌশলে দেহস্থিত শুক্রবিন্দু সমূহের বহির্নিঃসরণ-পথ বন্ধ করিয়া দিতে পারিলেই ব্রহ্মচর্য্য পূরাপূরি রক্ষিত হইল, তাহা নহে; সযত্ন-সঞ্চিত বীর্য্য-বিন্দুসমূহ দেহকে যে কান্তি, পুষ্টি ও পৌরুষ দান করিল, তাহাকে জগতের কল্যাণ-মহাযজ্ঞে আহুতি দেওয়ার নামই ব্রহ্মচর্য্য।

———

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ব্রহ্মচর্য্যের প্রতিষ্ঠা-ভূমি

ঋষিশক্তি-শাসিত ভারত জানিত, মানুষের সমগ্র জীবনই একটা সাধনা, অতএব তাহার জীবনের প্রত্যেকটী অংশও এক একটী বিশিষ্ট সাধনা। তাই তাঁহাদের কাছে ব্রহ্মচর্য্য ও সন্ন্যাসাদি যেমন সাধনা বা তপস্যা বলিয়া গণিত হইত, গার্হস্থ্যও তেমনি তপস্যার অঙ্গীভূত ছিল। শুধু তাহাই নহে, ভারতীয় শাস্ত্রকার সহস্রবার গার্হস্থ্য নীতিকে সন্ন্যাসী বা যতির নীতি অপেক্ষা অধিকতর ধীরতার সহিত আলোচনা ও অনুশীলন করিয়াছিলেন। তাহারই ফলে সমগ্র ভারতে এক অপূর্ব্ব মানবতা বংশানুক্রমিকভাবে ক্রমবির্দ্ধমান রহিয়া ভারতের মান-যশ, ভারতের গৌরব-প্রতিষ্ঠা গঠন করিয়াছিল।

প্রকৃত প্রস্তাবে কিন্তু জীবনের কোনও একটা অংশই অপর অংশ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বা নিকৃষ্ট নহে। প্রত্যেকেই নিজ নিজ প্রতিষ্ঠা-ভূমিতে শ্রেষ্ঠ। বালকের বা যুবকের অপেক্ষা বৃদ্ধ জ্ঞানে ও অভিজ্ঞতায় অগ্রসর বলিয়াই বাল্যকাল বা যৌবন বার্দ্ধক্যের কাছে হীনপ্রভ হইবে, তাহা নহে। বাল্য বাল্যেরই সরলতায় সরস, যৌবন যৌবনেরই গৌরবে উজ্জ্বল, বার্দ্ধক্য বার্দ্ধক্যেরই মহিমায় উন্নত। ইহার মধ্যে ছোট-বড়র বাছ-বিচারের প্রসঙ্গ আসে না। প্রকৃতির শারদ-শোভা ঝরিয়া পড়িয়াই নব বসন্তের

প্রফুল্লযৌবন আসে, তাই বলিয়া শারদীয়া প্রকৃতির গৌরব কমে না। বাল্য মরিয়া যৌবনের প্রাণ-সঞ্চার করিয়াছে, যৌবন মরিয়া বার্দ্ধক্যের জন্মদান করিয়াছে; পূর্ব্ববর্ত্তীর আত্মদান ব্যতীত পরবর্ত্তীর আবাহন হইত না। ব্রহ্মচর্য্যেরও সাধনা তেমনি পরবর্ত্তী গার্হস্থ্য সাধনার জন্য সাধকের জীবনকে সর্ব্বতোভাবে প্রস্তুত করিয়া দেয় বলিয়াই ব্রহ্মচর্য্যের গৌরব। প্রকৃত গার্হস্থ্য-তপস্যা সাধককে সর্ব্বত্যাগ-মহামন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া বৃহত্তর জগৎ-কল্যাণে নিঃশেষে আত্ম-সমর্পণ করিতে যোগ্যতা দান করে বলিয়াই গার্হস্থ্যের সম্মান। পূর্ব্ববর্ত্তী সাধনটী ষোল কলায় ফুটিতে না পারিলে পরবর্ত্তী সাধনটী কিছুতেই পূর্ণরূপে ফুটিতে পারে না, অতএব সমগ্র-জীবনরূপ যে সমষ্টি-সাধনা, তাহা ব্যষ্টির অপূর্ণতায় পঙ্গু রহিয়া যায়। এই জন্যই প্রত্যেকটী সাধনা নিজ নিজ সংস্থান-কেন্দ্রে, নিজ নিজ প্রভাব-ক্ষেত্রে, নিজ নিজ আদর্শানুগ প্রয়োগে শ্রেষ্ঠ। গার্হস্থ্য বা সন্ন্যাস, ইহাদের মধ্যে কোন্ চর্য্যা শ্রেষ্ঠ, কোন্টা নিকৃষ্ট, তাহার বিচার একটার সহিত আর একটার তুলনা করিয়া করা সম্ভব নহে। কোন্টা যথার্থই যোগ্য ভাবে আরব্ধ হইয়াছিল, কোন্টা পূর্ণতঃ প্রতিফলিত হইয়াছিল, জীবনের নির্দ্দিষ্ট অঙ্গগুলির দৃঢ়তা ও উপযোগিতা কোন্ তপস্যা কাহার মধ্যে কতটা স্থায়ী ভাবে বাড়াইয়াছে, তাহার নির্ণয়ের উপর ইহাদের শ্রেষ্ঠতা নির্ভর করে। অর্থাৎ তপস্যার হিসাবে কেহই

ছোট নহে, কিন্তু প্রয়োগের হিসাবে পাত্র-বিশেষে একে ছোট, অপরে বড় অথবা উভয়েই ছোট কিম্বা উভয়েই বড়।

তথাপি, ভূমিষ্ঠ হইবার পরেই শিশু জননীর অথবা অভাবে গোমাতার ও ধাত্রীর স্তন্য পান করিয়া যে প্রাণ রক্ষা করে, বর্দ্ধিত বয়সে সমগ্র জগতের আহারীয় বস্তুরাশি আহরণ করিয়াও ঠিক সেই প্রাণ রক্ষা করিলেও, যেমন শৈশব-পীত দুগ্ধের মূল্য শ্রদ্ধার মুদ্রায় আমরা অনেক বেশী দিয়া থাকি, তদ্রূপ বাল্যে জীবনের গঠন-কার্য্যে যে সাধনা প্রথম দিগ্‌দর্শন করিল এবং ভবিষ্যতের গার্হস্থ্যাদি সাধনার সার্থকতার সম্ভাবনাকে যে-সাধনা সহজ করিয়া দিল, তাহার মূল্য আমরা বেশী দিতে চাহিব। ভারতীয় শাস্ত্রকারগণ গার্হস্থ্য সাধনার শতমুখ প্রশংসা করিলেও ব্রহ্মচর্য্য-সাধনা ব্যতীত যখন পূর্ণাঙ্গ গার্হস্থ্য অসম্ভব, তখন আমরা ব্রহ্মচর্য্য-সাধনারই জয় জয়কার দিব। আর, তাহারা যে গার্হস্থ্য-সাধনার প্রশংসা করিয়াছেন, তাহাও যে একমাত্র ব্রহ্মচর্য্য-পুষ্ট গার্হস্থ্যই, তাহাও সহস্রবার বলিব।

এই মাত্র। নতুবা ব্রহ্মচর্য্য যদি শুধু ব্রহ্মচর্য্যেরই জন্য হয়, তবে বর্ত্তমান "art for art's sake"—শ্রেণীর সাহিত্য-চর্চ্চীদের ন্যায় ব্রহ্মচারীর ব্রহ্মচর্য্য দেশের, দশের এবং জগতের মঙ্গল-প্রার্থীদিগের প্রতিকূল সমালোচনারই বিষয় হইয়া রহিবে। পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে * আমি ব্রহ্মচর্য্য বলিতে যাহা বুঝিয়াছি এবং

বুঝাইয়াছি, এই প্রবন্ধে * ঠিক তাহাই বুঝিতেছি না। ব্রহ্মচর্য্য বলিতে যে প্রচলিত অর্থটীর ব্যবহার হয়, আমি সেই অর্থেই এই শব্দটী এখানে প্রয়োগ করিতেছি। পূর্ব্ববর্ত্তী প্রসঙ্গে ব্রহ্মচর্য্য বলিতে আমাদের সমগ্র জীবন-সাধনাকেই লক্ষিত করিয়াছি, অর্থাৎ সংযমের অভ্যাস, তল্লব্ধ শক্তি-সামর্থ্যের প্রয়োগ এবং প্রয়োগের আদর্শ, এই সব লইয়া ঐ ব্রহ্মচর্য্য মানবের নিত্য এবং নিয়মিত, প্রাত্যহিক এবং আকস্মিক, দৈনন্দিন এবং জন্মযুগান্তরীণ সাধনাকে বুঝাইয়াছে। কিন্তু এই স্থলে ব্রহ্মচর্য্য বলিতে সেই ব্যাপক অর্থ না ধরিয়া তোমাদের সুবিধার জন্য তোমাদের চিরকালের জানা অর্থে ব্যবহার করিতেছি। ব্রহ্মচর্য্য বলিতে এখানে আমি বীর্য্যধারণ, বীর্য্যরক্ষা বা শুক্রক্ষয়-নিবারণই বুঝিতেছি।

ভগবানের বিশেষ করুণায় বর্ত্তমান সময়ে দেশের প্রায় সর্ব্বত্র ব্রহ্মচর্য্য কথাটা লইয়া অল্প-বিস্তর সাড়া পড়িয়াছে দেখিতে পাই। কিন্তু এই সাড়া এখনও আমাদের পূর্ণ কল্যাণকে জাগ্রত করিতে পারে নাই। তাহার কারণ, অনেকস্থলে ব্রহ্মচর্য্যের একটা অভিনয় চলিয়াছে এবং বহুস্থলে ব্রহ্মচর্য্য একমাত্র ব্রহ্মচর্য্যেরই জন্য অনুষ্ঠিত হইতেছে, রুক্ষকেশ একমাত্র রুক্ষকেশেরই জন্য রক্ষিত হইতেছে, তৈল-পাদুকা একমাত্র বর্জ্জনেরই জন্য বর্জ্জিত হইতেছে, বৃহত্তর

* মূল লেখায় "পরিচ্ছেদে" এবং "প্রবন্ধে" স্থলে "পত্রে" কথাটী ছিল।

জগতের বৃহত্তর অবস্থাসমূহের সৃজন বা নিরাকরণে এই ব্রহ্মচর্য্য কার্য্যকারী হইতেছে না। টাইটানিকের মত একখানা বিরাট জাহাজ আমাকে দাও, আর আমি যদি না ঠিকই করিতে পারি যে, জাহাজ কোন্ দিকে চালাইব, কোন্ বন্দরে নিয়া তুলিব, তাহা হইলে জাহাজ পাওয়া না পাওয়ায় বিশেষ পার্থক্য থাকে না। এইরূপ ব্রহ্মচর্য্য, যাহা ব্যক্তির জীবনে নিরর্থক, (কারণ উহা ব্যক্তির জন্ম-কর্ম্ম পরার্থে সার্থক করিতে শিখাইল না) এবং যাহা জাতির স্কন্ধে গুরুতর বোঝা ও দায়, (কারণ শত শত স্থলে ইহা অকারণ কর্ম্মহীনতা ও ভিক্ষুকবৃত্তিরই প্রশ্রয় দিয়াছে,) তাহা দিয়া আমরা কি করিব? তাহা হইতে আমাদের বা অপরের কোন্ কল্যাণ প্রসূত হইবে? আর, অভিনীত ব্রহ্মচর্য্য যে ব্রহ্মচর্য্যই নহে এবং তাহা যে কোনও কাজেই কদাপি আসিবে না, আসিতে পারে না, তাহা কে না বোঝে? বৃক্ষ-পত্রের স্বেদবিন্দু দেখিয়া আমরা শিশির-কণা বলিয়াই ভুল করিতে পারি এবং শীতের ঠোঁট-ফাটা সারাইবার জন্য সাদরে ওষ্ঠে মাখিতেও পারি। কিন্তু শিশির ছাড়া ঠোঁটের ফাটা সারিবে না। শিশিরবিন্দু ভাবিয়া যতদিন পর্য্যন্ত বৃক্ষপত্রের বা তৃণের স্বেদবিন্দু ঠোঁটে মাখিব, ততদিন পর্য্যন্ত সোজা সরল কথাও ঠিক্‌ঠিক্ কহিতে পারিব না, শত ইচ্ছা থাকিলেও দেহের ধর্ম্মে বাঁকা কথা আসিবে। সব সময়ে আমরা সাদা চ'খে অভিনয় ধরিতে পারি না। পরেরটা ত' দূরের কথা,

নিজেই নিজের অভিনয় অনেক সময়ে বুঝিয়া উঠিতে পারি না, নিজের ন্যাকামী প্রথম দৃষ্টিতে চ'খে পড়িতে চাহে না। তথাপি ইহা ধ্রুব সত্য, অভিনয় অভিনয়ই। তবে কথা এই যে,—সত্যের অভিনয় সত্যাশ্রিত অভিনয়, মিথ্যার অভিনয় মিথ্যাশ্রিত অভিনয়। অর্থাৎ পূর্ব্বপক্ষে মিথ্যা সত্যকে চাহিতেছে, শেষপক্ষে মিথ্যা একমাত্র মিথ্যাকেই চাহিতেছে। মিথ্যা যদি সত্যকে চাহে, তবে একদিন বা ভগবানের বিশেষ করুণা অবতীর্ণ বা অনুভূত হইলে নিজ হীনতা বিসর্জ্জন দিয়া অর্থাৎ নিজস্বতা পরিহার করিয়া সত্যেই লীন হইতে পারে; মিথ্যা যদি মিথ্যাকে চাহে, তবে শত কোটি মিথ্যাই প্রসূত হয়, বংশ-বিস্তারের প্রাবল্যে জগৎ ছাইয়া যায়, মানুষের সকল সুখ-শান্তি একেবারে ব্যবায়ী বিষের মত আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। সত্যের, সুন্দরের অভিনয়ের পক্ষে এই একটুকু মাত্র বলিবার আছে। কিন্তু যেখানে লক্ষের মধ্যে একটী ব্যতিক্রম দেখা গিয়াছে, সেখানে ব্যতিক্রমটীর উপরে জোর দিয়া বা আস্থা ন্যস্ত করিয়া মিথ্যার বেসাতি লইয়া মিথ্যারই বিকিকিনি করিবার দুঃসাহস সকলের থাকে না এবং না থাকাই ভাল। কারণ, অভিনয় অভিনয় বৈ ত' নয়।

অভিনীত জীবনে উচ্ছ্বাস আসিতে পারে, প্রতিষ্ঠা আসে না। দৈনন্দিন জীবনে মিথ্যার দাসত্ব করিয়া অনন্ত জীবনে সত্যস্বরূপকে পাওয়া যায় না। তাই, দেশে ব্রহ্মচর্য্যের সাড়া পড়িলেই আহ্লাদের বেশী কিছু নাই।

আজিকার সমাজে অবশ্য অভিনয়ের অভাব নাই, কিন্তু তাই বলিয়া জলচল অভিনয়গুলির দোহাই দিয়া আরও দুই চারিটা অভিনয়কে চল্ করিয়া লইবার অধিকার কাহারও নাই। রাম গাঁজা খায় বলিয়া মদ খাইবার স্বাধীনতা তাহাকে দেওয়া যায় না; যদু চুরি করে বলিয়া ডাকাতি করিবার ছাড়পত্র তাহাকে লিখিয়া দেওয়া চলে না। গাঁজাও বন্ধ করিতে হইবে, চুরিও থামাইতে হইবে। যে পড়ুয়া ছেলে দিনরাত মায়ের উপর লাঞ্ছনা গঞ্জনা করিয়া বিবাহযোগ্য বয়সে হঠাৎ মাতৃভক্ত হইয়া পড়ে এবং সাংসারিক কাজ-কর্ম্মের গুরুতর চাপে মায়ের স্বাস্থ্য-ভঙ্গ হইল বলিয়া যার চক্ষু অশ্রুতে উছলিয়া ওঠে, সে ছেলে অভিনয়ই করে। যে বিপত্নীক ব্যক্তি মাতৃহারা ছেলে পিলের আদর-যত্নের জন্য বুড়া বয়সে বরের টোপর মাথায় পরিয়া কলাতলা বেড়াইয়া আসা একান্ত কর্ত্তব্য বলিয়াই মনে করে এবং নিজের তেমন ইচ্ছা না থাকিলেও হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধুস্বজনের ঐকান্তিক অনুরোধে পড়িয়াই মনুষ্য-জীবনের আরও কত কর্ত্তব্য পরে সম্পাদন করিবার জন্য লোহার সিন্ধুকে তালাচাবি মারিয়া রাখিয়া পুনর্বিবাহরূপ আগন্তুক কর্ত্তব্যটাই আগে সম্পাদন করে, সে একজন বাহাদুর অভিনেতা। দেশের দুঃখে কষ্টে প্রাণ যেন এখনই বাহিরিয়া যায়, এমন আর্ত্তি ও আকুলতা লইয়া আসিয়া যে দেশ-কর্ম্মী শত সহস্র দেশবাসীর মনে ভাবোচ্ছ্বাস জাগ্রত করিবার

পরে হঠাৎ একদিন "মতের পরিবর্ত্তন প্রতিভারই প্রমাণ" বলিয়া আচম্বিতে আলগোছ হইয়া সরিয়া পড়েন, তাহার কাজেও অভিনয় বড় কম নহে। তৃণ-গাছটী হইতে আরম্ভ করিয়া বিরাট মহীরুহ পর্য্যন্ত সবাই নকল ফুলে পুষ্পিত হইতে চাহে, ইহাই আজিকার সমাজের অবস্থা। অথবা সমাজের প্রকৃত অবস্থা ইহা হইতেও অনেক ভীষণ, অনেক জঘন্য। তরঙ্গ দেখিয়া যেমন সমুদ্রের জলস্রোত কোন্ দিকে চলিয়াছে, বলা চলে না, আমাদের সমাজকেও দেখিয়া আজ আর তার স্রোতের গতি বুঝিয়া উঠা যায় না। সমুদ্রের তরঙ্গ যখন গড়াইয়া গড়াইয়া একদিক হইতে অন্যদিকে যায়, তখন তার জল-গতি কিন্তু ঊর্দ্ধ হইতে নিম্নাভিমুখে চলিতে থাকে। আমাদের মোহ-ঘোরাচ্ছন্ন সমাজ যখন অনেক ডাকাডাকির পরে আপাত-দৃষ্টিতে পাশ ফিরাইয়াই শুইল, তখন তার জলগতি যে উপর হইতে নীচের দিকে তীরবেগে ছুটিয়াছে, তাহা আমরা কেমনে বুঝিব? সমাজ-অটবী অফুলা, অফল্যা বন্ধ্যাদশাপন্না বিটপী শ্রেণীতে আকীর্ণা। আজ তার এই অবস্থা দূর ত' করিতে হইবে। কিন্তু তার জন্য যে অটুট বীজশক্তি চাই। যাহা বর্ত্তমান, তাহা ভবিষ্যতের কোলে ঘুমাইয়া থাকিবে, কিন্তু যাহা ভবিষ্যৎ, তাহা অনন্তকাল অমর রহিবে। তাই আজ ভবিষ্য-শক্তির উদ্বোধনের জন্য জগদ্ধাত্রীর উপাসনা করিতে হইবে। তিনি অপাপবিদ্ধা, তিনি অকামলভ্যা,

—তিনি অক্ষতযোনি। তিনিই সেই বীজশক্তি প্রসব করিবেন এবং বীজশক্তি অক্ষয় আদর্শে উপ্ত হইলে ক্রম-চলমান কাল-সহকারে ভারত উদ্যানের প্রতি তরু কল্পতরু হইবে এবং শাখায়, কাণ্ডে, পুষ্পে, পত্রে, ফলে, মূলে সুন্দর, সুরূপ, সরস ও সুখদ হইবে।

ব্রহ্মচর্য্যে জগদ্ধাত্রীর পূজা হয়, ব্রহ্মচর্য্যে তিনি বীজশক্তির প্রসূতি হন। তাই, জীবন-সাধনার অংশ সাধনা-চতুষ্টয়ের বাস্তব মহিমা সমান স্বীকার করিয়াও আজ এই অবনত যুগের এই অন্ধকার রাত্রিতে ব্রহ্মচর্য্যের প্রতিই পক্ষপাত করিতেছি। কারণ, আজ আমি নির্ভুলরূপে জানিয়াছি, ব্রহ্মচর্য্যের প্রভাত-সূর্য্যের উদয় হইলে এই অন্ধকার থাকিবে না, সেই সূর্য্যের আলোকে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড পর্য্যটন করিয়া জগতে আমার আপনার-জনদের খোঁজ লইতে পারিব।

তৃতীয়-পরিচ্ছেদ

জাগো বীর সকলের আগে

তোমার জাগিতে হইবে সকলের আগে। আর সকলে যখন শয্যার ক্রোড়ে মৃতবৎ পড়িয়া থাকিবে, তখন হইতেই তোমাকে জগৎ-কল্যাণ-কর্ম্মে শ্রমরত হইতে হইবে। নিদ্রার আলস্য সহজে গা-ঝাড়া দিয়া ফেলিয়া দেহ ও মনকে সম্যগ্‌রূপে শৈথিল্যরিক্ত ও ভারমুক্ত করিয়া লইতে হইবে। ডাকিলে যাহারা সাড়া দেয় না, মারিলে যাহাদের ঘুম ভাঙ্গে না, ইচ্ছার ইঙ্গিতে তাহাদের শতবর্ষের জড়তা দূর করিবার সামর্থ্য সঞ্চয় করিতে হইবে। কিন্তু সামর্থ্য-সঞ্চয় হাটে-বাজারে হয় না, শক্তির সাধনা করিতে হয় নিভৃত তপোবনে।

দেশের পরম দুর্ভাগ্য, আজ তপোবন নাই, অতীতের কত সুখস্মৃতিমাখা আছে এক সমুচ্চ ভগ্নস্তূপ, এক ধূ-ধূ মরুভূমি, এক মহিমময় মহাজাতির সমাধি-শয়নের শ্মশান-চ্ছবি। আজ যে তপোবন চাই! তপোবনের শান্ত, সৌম্য, সুন্দর আলেখ্য দেখিয়া নয়ন যে জুড়াইতে চাই। যাহা দেখিলে দেখা সার্থক হয়, তাহারই জন্য আমার নয়ন শতবার শতদিকে তাকাইতেছে, কিন্তু মৃত্যুর শীতলতা আর মরুবায়ুর উষ্ণ কঙ্করের যাতনা সে সহিতে পারে নাই। তাই, সে শতবার নিমীলিত হইয়াও বার বার তোমাদেরই পানে চাহিয়াছে। তোমরা যদি ভারত-

শ্মশানের এই কাল-করাল কদর্য্য দৃশ্য দূর করিয়া হর্ষ-হসিত হরিত-শোভা আনিতে পার, তবে তাহার তিয়াস্ মিটিবে।

কিন্তু যাহারা তপোবন গড়ে, তপোবনের শান্ত স্নিগ্ধতায় তাহাদিগকে আবার আত্ম-জীবন গঠন করিতে হয়। তোমার তপোবন তোমার তপোবলে হইবে, খোশ-খেয়ালে হইবে না। তোমার তপস্যার তপোবনে যদি বিহগ-কাকলিতে নিত্যাভয়-পুরুষের মধুনাম ধ্বনিত হইয়া থাকে, তবেই তোমার গঠিত তপোবনে কোয়েলা-দোয়েলা তেমনি ভাবে কুহরিবে! তোমার তপস্যার তপোবনে কুসুমপুঞ্জ যেভাবে মঞ্জরীর বুকে বুকে মুকুলিত হইয়াছে, মধুকর যেই আকুলতায় ফুলে ফুলে মধু আহরণ করিয়াছে, জানিও, তোমার জীবনের প্রাণপাত শ্রমে গঠিত তপোবনে তাহার বিন্দুমাত্র ব্যত্যয় হইবে না। মানুষের কথায় ব্যতিক্রম ঘটে, ভবিষ্যৎ-নির্দ্দেশ উলটিয়া যায়, কিন্তু কর্ম্মে সে যাহা বলিয়াছে, তপস্যায় সে যাহা নির্দ্দেশ করিয়াছে, তাহার ব্যতিক্রম নাই।

প্রশ্ন করিবে যে, তোমার আজিকার তপস্যার জন্য তপোবন কৈ?—যেখানে তুমি জীবন গঠন করিবে, সেই সাধনাশ্রম কোথায়?

কিন্তু তাহার জন্য ভাবিও না। কোন্ তপোবনে বসিয়া আজ তুমি তপোবল সঞ্চয় করিবে, তাহার নির্দ্দেশ করিতেছি। জানিও, এই জগৎ একেবারে তার সমগ্র অস্তিত্বেই একটী

তপোবন। যখন তুমি তাপস-মূর্ত্তিতে তাপস-দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিবে, তখনই সে তপোবন। যখন তোমার চিত্ত স্থির, মন শান্ত, প্রাণ সংযত, তখনই সে তপোবন। যখন তোমার বুদ্ধি বিনীত, মেধা শুশ্রূষু, হৃদয় নির্ভীক, তখনই সে তপোবন। তোমার তপঃপ্রেরণা যদি অব্যভিচারিণী নিষ্ঠায় দিবারাত্রই জাগ্রত থাকে, তবে দিবারাত্রি "জগদেব নন্দনবনং"। আর যদি তপঃপ্রেরণা সাময়িক ভাবে তোমার সর্ব্বস্ব অধিকার করিয়া থাকে, তবে সাময়িক ভাবেই জগৎ তপোবন।

কিন্তু বহিঃপ্রকৃতির স্থিরতা ও চঞ্চলতার একটা সাম্য ও নৈকট্যের সম্বন্ধ রহিয়াছে বলিয়া কোন কোনও সময় আমাদের পক্ষে এই জগৎ প্রয়াস-সিদ্ধ তপোবন,—কখনও বা একেবারে স্বভাব-সিদ্ধ-তপোবন। ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে এই জগৎ আমাদের মনের পক্ষে সহজে-সিদ্ধ তপোবন। এই সময়ে জগতের শান্ত স্নিগ্ধ সরলতায় মন ডুবিয়া থাকিতে পারে, আবার মনের অচঞ্চল স্থির গাম্ভীর্য্যে সমগ্র জগৎ ডুবিয়া যাইতে পারে।

এই শুভ মুহূর্ত্তে জীবন-গঠনের প্রয়াস পাইও, সাধনাকে গোপন রাখিয়া তপস্যাপরায়ণ হইও; দেহে বল আসিবেই, মনে উৎসাহ জাগিবেই, হৃদয়ে শক্তির সঞ্চার হইবেই। ভগবানে দৃঢ় নির্ভর রাখিয়া, গুরূপদেশে আস্থা রাখিয়া, আত্মশক্তিতে বিশ্বাস রাখিয়া, বিনয়াবনম্র চিত্তে, ভক্তি-শ্রদ্ধাবনত অন্তঃকরণে, সংযম-শুদ্ধ ভাববিহ্বলতায় সকল বন্ধনের স্মৃতি বিস্মৃত হইয়া

তপশ্চারী হইও। জগদ্ধিতায় যদি ব্রহ্মচারী হইতে চাহ, এই অমূল্য সময় হারাইও না। সমগ্র দিন জগতের সাথে সমান পায়ে চলিতে যে পাথেয় লাগিবে, তাহা সমগ্র দিনের পরিশ্রমেই উপার্জ্জন করিতে পারিবে; কিন্তু ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে যেটুকু উপার্জ্জন করিবে, তাহা দিয়া তুমি জগতের আগে চলা আরম্ভ কর।

———

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

জাগি কেমনে?

সম্ভবমত এবং অভ্যাসানুযায়ী সূর্য্যোদয়ের এক ঘণ্টা হইতে দুই ঘণ্টা পূর্ব্বে শয্যাত্যাগ প্রয়োজন। সদ্‌গুরুর সঙ্গলাভ যাঁহারা লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষে সাধনের জন্য ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সময় আর নাই। এই সময়ে মৃদু-মধুর স্নিগ্ধ বায়ু-প্রবাহ বহিতে থাকে, সাধকেরা ইহাকে বীরবায়ু বলিয়াছেন। এই বায়ু সেবনে মানুষের দেহের এবং মনের যাবতীয় পঙ্গুতা, জড়তা ও দুর্ব্বলতা দূরীভূত হইয়া মৃতসঞ্জীবনী-প্রভাবে পুনর্জ্জীবিত যোদ্ধার ন্যায় নবশক্তি লাভ হইয়া থাকে। সুতরাং এই সময়ে যাহারা নিথর নিদ্রায় নয়ন নিমীলিত করিয়া কাটায়, তাহারা জীবন-রণাঙ্গনের জন্য অজ্ঞাতসারে নিদারুণ নিগ্রহ-নিচয় সঞ্চয় করে এবং নিঃশ্রেয়স নিত্যানন্দের নিগূঢ় সৌভাগ্য হইতে নিজেদিগকে বঞ্চিত করিয়া থাকে।

বলিতে পার, "উঠিতে পারি না, তার কি করি?" কিন্তু এই কথা শুনিয়াই ত' আর তোমাকে ছাড়িয়া দিতে পারি না। উঠিতে যখন পার না বলিতেছ, তখন তোমাকে উঠিতেই হইবে। যাহাকে সাধ্যের অতীত বলিয়া মনে করিতেছ, তাহাকে অনায়াসে আয়ত্ত করিতে হইবে। নতুবা তোমার জীবন দিয়া তোমারও কোনও কাজ হইবে না, জগতেরও কোনও কাজে উহা আসিবে না। ঝড়ের বাতাসেও যাহারা নিশান ধরিতে

জানে, উত্তাল তরঙ্গের মুখেও যাহারা হাল ধরিতে পারে, তাহারাই সকল সমুদ্রের পারাপার অগ্রাহ্য করিয়া আনন্দময়ের অমৃত-স্পর্শ কুড়াইয়া আনে এবং জাতি-ধর্ম্ম-বর্ণ-নির্ব্বিশেষে তাহা দশদিকে ছড়াইয়া দেয়। তোমাকে বাঁচিতে হইবে জগতের কাজে, এই জগতের মাঝে তোমাকে মরিতে হইবে বীরেরই সাজে, তোমার মুখে বাজে হতাশার অকেজো কথা শুনিয়া আমিও বিরত হইতে পারিব না, তোমারও আমার কথা শুনিয়া বিরক্ত হইলে চলিবে না। সকাল-সকাল ঘুম হইতে উঠা একটা শক্ত ব্যাপার কিছুই নয়। তোমার যদি সঙ্কল্পের শক্তি এক কণাও থাকে, তোমার যদি জীবনাদর্শের প্রতি ভক্তি অণুমাত্রও থাকে, তাহা হইলে নিদ্রার শৃঙ্খল হইতে মুক্তির জন্য তোমাকে ভাবিতে হইবে কেন? দেহের নিদ্রা ভাঙ্গিয়া দেওয়া ত' আদৌ কঠিন নয়, এমন কি মনের ঘুমঘোর টুটানও একটা ইসারার ব্যাপার মাত্র!

সঙ্কল্পের জগজ্জয়িনী শক্তিতে তুমি সব করিতে পার, অভ্যাস পরিবর্ত্তন ত' একটা তুচ্ছ কথাই, তুমি ইচ্ছা-বলে বিশ্বামিত্রের মত নূতন সৃষ্টি আরম্ভ করিতে পার। সঙ্কল্পের প্রভাব অলঙ্ঘনীয়। জীবনের পথে যতই অগ্রসর হইবে, ক্ষুদ্র হইতে বৃহৎ সকল সাফল্যের মধ্যে ইহার নির্ভুল প্রমাণ পাইবে। হাতীর বিশাল কাণ যেমন তার বিরাট আয়তনকে দেখিতে

দেয় না, তেমনই তোমার শত প্রকারের সংস্কারের আব্‌ছায়া তোমার দৃষ্টি-শক্তিকে পথিমধ্যে প্রতিহত করিয়া রাখিয়াছে। তাই, তুমি নিজের অসীম অখণ্ড-শক্তিকে না জানিয়া ভ্রমবশতঃ নিজেকে ক্ষুদ্র, দীন ও দুর্ব্বল মনে করিতেছ এবং বাধাকে তোমার অপেক্ষা শক্তিমান্ ও প্রবল বিবেচনা করিতেছ। সিংহ-শিশু যেমন শৃগালী-প্রতিপালিত হইয়া শৃগাল-কুল-সংসর্গে নিজ সিংহ-বীর্য্য-সম্ভবতা বিস্মৃত হইয়া শৃগালের ভয়যোগ্য প্রাণি-মাত্রেরই দর্শনে ভয়াকুল হইয়া পড়িত, তুমিও তেমনই আজ বিস্মৃত হইয়া গিয়াছ যে, তুমি ব্রহ্মবীর্য্যজাত এবং ব্রহ্ম-যোনি-প্রসূত, সুতরাং তুমি ব্রহ্মশক্তির অদ্বিতীয় অধিকারী।

যেই মুহূর্ত্তে জানিয়াছ যে, তুমি আদ্যাশক্তির সন্তান, তন্মুহূর্ত্তে তোমার সংশয়াকুল দোলায়মান সন্দিগ্ধভাব বিদূরিত হইবে এবং তোমার সঙ্কল্প সুদৃঢ় হইয়া তাহার লক্ষ্যকে করামলকবৎ আয়ত্ত করিবে। তাই, এই মুহূর্ত্তেই আজ জানিয়া লও যে, তুমি অপ্রতিদ্বন্দ্বীর সন্তান, তুমি সর্ব্বদা সর্ব্বথা জগজ্জয়ী এবং জগদ্বরেণ্য। তোমার প্রতিষ্ঠাকে কেহ টলাইতে পারে না, তোমার প্রাবল্যকে কেহ কমাইতে পারে না, তোমার প্রজ্ঞা কখনও অন্ধ হয় না, তোমার প্রতিভা কখনও স্থূল হয় না, তোমার সঙ্কল্প কখনও ব্যর্থ যায় না; কারণ, তুমি তাঁহারই সন্তান, যিনি অক্ষয়, অনন্ত, সর্ব্বশক্তিমান্।

এই বোধকে অহঙ্কতের দম্ভোদ্ধত অতি-কথা বলিয়া মনে করিবার কোনও হেতু নাই। কারণ, আমাদের সত্ত্ব-রজস্তমো-গুণাবলী একমাত্র যাঁহার সর্ব্ববরেণ্য শক্তিবলে আমাদের ধীশক্তি এবং প্রতিভাশ্রিত প্রতিকর্ম্মে প্রেরিত হইতেছে, সেই পরমপুরুষকে অদ্বিতীয় জানিয়া প্রশংসা করাও যেই কথা, আবার আমাদিগকে তাঁহাতেই নিমজ্জিত, তাঁহা হইতেই নির্গত, তাঁহাতেই সংলগ্ন ও তাঁহাতেই সংন্যস্ত জানিয়া আমাদের আত্মশক্তির প্রশংসা করাও সেই কথা। তাঁহারই শক্তিতে শক্তিমান্ জানিয়া আমরা নিজের পৌরুষের গৌরব করিতে পারি, তাঁহারই প্রতিভায় প্রতিভাত জানিয়া নিজেদের মেধা-মনীষাকে আমরা শ্রদ্ধা করিতে পারি। আমার সব কিছু যখন তাঁহার, তখন আমাকে শ্রদ্ধা করিয়া আমি তাঁহাকে অশ্রদ্ধা করি নাই, আমার গৌরব দেখিয়া তাঁহাকে অগৌরব দেই নাই।

নিজেকে প্রমূর্ত্ত ব্রহ্মবীর্য্য জানিয়া সঙ্কল্প করিও, কিছুতেই তাহা ব্যর্থ যাইবে না। শয়নকালে মনের সকল সন্দিগ্ধ অবিশ্বাস পদাঘাতে ঠেলিয়া ফেলিয়া, প্রাণের সকল চঞ্চলতা স্থগিত করিয়া, সুস্পষ্ট দ্বিধাহীন ভাষায় দৃঢ়কণ্ঠে সঙ্কল্প করিও,—"চন্দ্রসূর্য্যও যদি কক্ষভ্রষ্ট হয়, জগৎ-সংসার যদি প্রলয় প্লাবনে ডুবিয়াও যায়, তথাপি আমি ঠিক অতটা অত মিনিটের সময়ে গাত্রোত্থান করিবই।" দেখিও, তাহা হইলে তোমাকে জাগাইবার জন্য এলার্মিং-ঘড়িরও দরকার পড়িবে না;

সকালে কেহ জাগিলে অনুগ্রহ করিয়া যেন জাগাইয়া দেয়, এই জন্য রামা-শ্যামাকেও রোজ রোজ অনুরোধ করিতে হইবে না।

শয্যায় যাওয়ার সময়ে জগতের বন্দনীয় মহাপুরুষদের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিও। বলিও,—

"হে প্রেমাবতার বুদ্ধ, আমার আত্মা তোমারই ন্যায় জগৎ-প্রেমে প্রবুদ্ধ হউক। হে ত্যাগাবতার যীশু, আমার আত্মা তোমারই ন্যায় ক্রুশ-কাষ্ঠে চরম-চরিতার্থতা লাভ করুক। হে কর্ম্মাবতার মহম্মদ, আমার আত্মা তোমারই ন্যায় সহস্র বাধায় বিচলিত না হইয়া মরু-প্রান্তরে ভগবানের নামের দিব্য সুধা বিতরণ করুক। হে চৈতন্য, হে শঙ্কর, হে নানক, তোমরা যে-ভগবানকে ভালবাসিয়া ভেদাভেদ ভুলিয়াছিলে, সেই ভগবানের প্রতি অবাধ প্রেম আমাতে সঞ্চারিত হউক। হে প্রমূর্ত্ত-প্রতাপ প্রতাপ-সিংহ তুমি যে আবেগ দিয়া মেবারের পাহাড়কে ভালবাসিয়াছিলে, সেই আবেগ, সেই স্বদেশ-প্রেম, সেই স্বজাতি-প্রীতি আমার হউক। হে গুরুশ্রেষ্ঠ গুরুগোবিন্দ, যে ঐক্যের প্রেরণায় তুমি বিরুদ্ধধর্ম্মী জনগণের প্রাণে ভ্রাতৃবোধ জাগ্রত করিয়া মানুষের জীবনের অমানুষ কর্ম্মের মধ্যে ভগবানকে প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছ, সেই ঐক্য প্রেরণা আমার মধ্যে সঞ্জাত হউক। হে শিবাবতার শিবাজী, যে মহনীয় আদর্শ তোমাকে সুখভোগ-সৌভাগ্যে উপেক্ষা করিয়া অরণ্য-পর্ব্বত-গুহায় শক্তি-সঞ্চয়ে প্রেরিত করিয়াছিল এবং যাহা তোমাকে গো-ব্রাহ্মণ-হিতার্থে নিয়োজিত করিয়াও পক্ষপাত-দোষে দুষ্ট করে নাই, পরধর্ম্মের অবমাননায় উৎসাহ দেয় নাই,—

৩

সেই সুমহান্ আদর্শ আজ আমাতে সংক্রামিত করিয়া দাও। আরও যত আছ মহাপুরুষ, যাঁহারা বিশ্ব জগতের জন্য অথবা তাহার অংশ-বিশেষের জন্য নিষ্কাম নিঃস্বার্থ আত্মত্যাগ করিয়া চরিতার্থতা লাভ করিয়াছ ; আরও যত আছ মহাপুরুষ, যাঁহাদের নাম জানি না, ধাম জানি না, কর্ম্ম-বিবরণী জানি না, যাঁহারা সকলের অজ্ঞাতে নিঝুম নীরবতার মধ্যে জীবের সেবা করিয়াছ, ভগবানের পূজা করিয়াছ, তাঁহাদের সকলের নিকট আজ আমি সাহায্যপ্রার্থী। ভবিষ্যৎ যুগ-সমূহে যাঁহারা শ্রীভগবানের অভয়-নামাঙ্কিত পতাকা বহিয়া তাপশীল জগতে শান্তি ও পাপশীল জগতে সান্ত্বনা দিতে আসিবেন, হে সেই সব অজাত অনাগত মহাপুরুষবৃন্দ, আমি তোমাদের নিকট সহায়তা যাচ্ঞা করিতেছি। তোমরা সকলে সকলের বিশিষ্টতা দিয়া আমাকে জগৎ-কল্যাণের পুঞ্জীভূত সামর্থ্যে সমৃদ্ধ কর। নিদ্রার অলসতা হইতে আমাকে তোমাদের এই তেজঃপুঞ্জ পৌরুষই যেন যথা সময়ে তুলিয়া দেয়, তোমাদের জীবনের পূর্ণ ও অপূর্ণ ভুবন-মঙ্গল-আকাঙ্ক্ষাই যেন আমাকে আমার কর্ত্তব্য ভুলিতে না দেয়।"

এইরূপ সাতদিন পদ্ধতিবদ্ধভাবে করিয়া দেখিও, অষ্টম দিনে মহাপুরুষেরা সবাই মিলিয়াই তোমাকে সাহায্য করিতে আরম্ভ করিবেন।

———

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

নিদ্রাভঙ্গের পরে

নিদ্রা ভাঙ্গিলেই কাল-বিলম্ব না করিয়া গাত্রোত্থান করিবে এবং শীতল জলের দ্বারা মুখ ও চক্ষুর্দ্বয় উত্তমরূপে ধৌত করিয়া ফেলিবে। অনেকে ঘুম ভাঙ্গিবার পরেও বিছানায় পড়িয়া গড়িমসি করে। কিন্তু ইহা জানিয়া রাখিও যে, বরং একটু বিলম্বে নিদ্রাভঙ্গ হওয়া ভাল, তথাপি ঘুম ভাঙ্গিবার পরে উঠি-উঠি করিয়া শুইয়া থাকা ভাল নয়। যাহারা এইরূপ আলস্যকে প্রকৃতিগত হইতে অবসর দেয়, তাহাদের শেষে এমন দশা দাঁড়ায় যে, শুধু যে শয্যাত্যাগের বেলাই তাহারা উঠি-উঠি করিয়া উঠে না, তাহা নয়, জীবনের ক্ষুদ্র-বৃহৎ সকল কাজের মাঝেই তাহারা দুর্নিবার আলস্যকে প্রশ্রয় দেয় এবং নির্লজ্জের মত কলঙ্কের পসরা বহিয়াও হাসিমুখে দুর্ব্বলতার গৌরব করে। জগতের কল্যাণে জীবনকে উৎসর্গ করিবে বলিয়াই তুমি ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত অবলম্বন করিতেছ, এই কথা সর্ব্বদা মনে রাখিও। সুতরাং তোমাকে ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে, তুমি যে তোমার শ্রান্ত দেহকে বিশ্রাম দিয়াছিলে, তাহাও একমাত্র আসন্ন ও ভবিষ্যৎ জগৎ-কল্যাণে তোমার দেহকে কর্ম্মক্ষম করিবারই জন্য। ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া দুইটা মধুর রসাল স্বপ্ন দেখিয়া রাত্রিটা কাটাইয়া দিয়া আবার সেই স্বপ্নেরই স্মৃতিতে পরের

দিনটাও কাটাইয়া দিবার জন্যই তুমি শয্যাতলে আশ্রয় লও নাই। সুখ-শয্যা হইতে দীর্ঘকাল নিজেকে স্বেচ্ছায় বঞ্চিত রাখিয়া যাহাতে ক্ষণিকের সুখের উপরে নিত্যকালের সুখকে জয়ী করিতে পার, নিমেষের লাভকে অনন্ত লাভের কাছে পদানত করিতে পার, ইসারার আনন্দকে দিশাহারা আনন্দে পরিণত করিতে পার, তার জন্যই তুমি শয্যায় রাত্রিকালে শয়ান হইয়াছিলে। সুতরাং জাগিয়া ঘুমাইবার তোমার অধিকার কৈ বাছা?

চক্ষুঃ-প্রক্ষালন

ভগবানের পরমমঙ্গল মহানাম করিতে করিতে যখন শীতল জলে চক্ষুঃপ্রক্ষালন করিবে, তখন মনে এই চিন্তা করিবে, যেন তোমার চক্ষুর জড়তা ও তন্দ্রাপসারণের সঙ্গে সঙ্গে তোমার লক্ষ-কোটি ভ্রাতাভগ্নীর চক্ষের তন্দ্রাও ঘুচিয়া যাইতেছে। জিজ্ঞাসা করিতে পার, ইহাতে কি লাভ হইবে? কিন্তু জিজ্ঞাসা না করিয়াও একমাত্র কথানুসারে কাজ করিয়াই দুইদিন পরে তুমি স্বয়ং ইহার লভ্যালভ্য স্পষ্ট উপলব্ধি করিতে পারিবে। সকল জ্ঞানের অপেক্ষা আত্মলব্ধ জ্ঞানের মূল্য বেশী, সকল উপদেশের অপেক্ষা প্রত্যক্ষ উপলব্ধির উপযোগিতা অধিকতর। জগৎকে আমরা চন্দ্রসূর্য্যের আলোকেই দেখিয়া থাকি, না, নিজের অন্তরের আলোকে চিনিয়া থাকি?

তথাপি তোমাকে বোঝ্ মানাইবার জন্য সামান্য একটুকু বলিতে পারি। অবশ্য আমি যাহা বলিতে সমর্থ হইতেছি, তুমি

নিজে যেদিন বুঝিতে শিখিবে, সেদিন ইহা সহস্র গুণেই বুঝিতে পারিবে।

প্রথম লাভ এই যে, সূর্য্যমুখী ফুল যেমন নিয়ত সূর্য্যের দিকেই মুখ করিয়া থাকে, ঝড়-বৃষ্টি বা বাদল-বাতাস মানে না, তুমি সেইরূপ নিয়ত দেশাভিমুখী. স্বজাতি-বিসর্পী বা বিশ্ব-প্রসারী রহিলে। ইহা বড় কম লাভ নয়। যখন আমি যেমন ভাবেই থাকি না কেন, তখনই আমি দেশ, জাতি ও বিশ্ব-জগতের কল্যাণেরই জন্য রহিলাম, এই সৌভাগ্যটুকু কয়জনের ভাগ্যে ঘটে? আত্ম-তুষ্টি ও স্বার্থ-সিদ্ধির ফন্দী-ফিকির খুঁজিয়া যেই জগতের অধিকাংশ মানুষ ক্লীব-কাপুরুষ হইয়া গিয়াছে, সেই জগতের মানুষ হইয়া আমি যদি নিজের নিদ্রায় জাগরণে জগদ্বাসীর নিদ্রা-জাগরণের কথা মনে করিতে পারিলাম, তাহা হইলে কি যথেষ্ট নহে?

দ্বিতীয়তঃ আমার ক্ষুদ্রাক্ষুদ্র কাজের মধ্যে সকলের কথা মনে পড়িলে সকলের আত্মার সঙ্গে আমার আত্মার যোগ সাধিত হয়। ফলে, যেখানে কোনও শক্তিযোগ্য কর্ম্মে আমার একার শক্তিই মাত্র প্রয়োজিত হইতেছিল, সেখানে সকলের অজ্ঞাতসারে সকলেরই সম্মিলিত শক্তি আমার মধ্য দিয়া এক-কেন্দ্রক হইয়া কার্য্য করিতে পারিল। ইহাতে আমিও শক্তিমান্ হইলাম, আমার কর্ম্মটীও সুসিদ্ধ হইল। যেখানে আমার একার সুখ-শান্তি একমাত্র আমাকে তৃপ্ত করিয়াই

চরিতার্থ হইতেছিল, সেখানে বিশ্বজনীন চরিতার্থতা পাইয়া আমার সুখশান্তি আমাকে গৌরব ও গুরুত্ব দান করিল।

এই ইঙ্গিতটুকুকে ধরিয়া হিসাবের খাতায় লাভের অঙ্ক যে কত জমা দেওয়া চলে, তার ইয়ত্তা নাই। কিন্তু তাহা এখন থাকুক। মোট কথা, বিশ্বজনীন চিন্তার অভ্যাসের দ্বারা কিরূপ কল্যাণ হয়, তাহা এক সপ্তাহ অভ্যাস করিলে তুমি নিজে বুঝিতে পারিবে, এক মাস অভ্যাস করিলে তোমার বন্ধু-বান্ধবেরাও তাহা বুঝিতে পারিবেন, আর, এক বৎসর অভ্যাস করিলে পথের অচেনা অজানা বাজে মানুষটাও তাহা বুঝিতে সমর্থ হইবে। সুতরাং প্রতি কার্য্যেই বিশ্বকে তোমার মধ্যে আনিও, তোমাকে বিশ্বের মধ্যে লইও।

মলমূত্র-ত্যাগ

স্বাভাবিক বেগ উপস্থিত না হইলে মলমূত্র-ত্যাগের জন্য কৃত্রিম বেগ প্রয়োগ করা কখনও কর্ত্তব্য নহে। তাহাতে অনর্থক পৈশিক উত্তেজনা জন্মে এবং পরবর্ত্তী প্রতিক্রিয়ায় পৈশিক শিথিলতা সঞ্জাত হয়। সুতরাং স্বাভাবিক বেগ যথাসময়ে উপস্থিত হইবার মত অভ্যাসটী ভালরূপে করিয়া লইবে। মলস্থানে যাইবার কিয়ৎকাল পূর্ব্বে সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া অথবা মলত্যাগ কালে যেরূপ ভাবে বসিতে হয়, তেমন ভাবে বসিয়া নিঃশ্বাস প্রশ্বাস যথাসম্ভব মৃদুগামী করিয়া মলদ্বারে কিছুক্ষণ মনঃস্থির করিলেই স্বাভাবিক ভাবে মলবেগ উপস্থিত

হইবে। মনঃস্থৈর্য্যের শক্তি অভাবনীয়। যেখানে দৈহিক প্রচেষ্টায় কার্য্যসিদ্ধি হয় না, মনঃশক্তির প্রভাবে সেখানে অনায়াসে কর্ম্ম-সম্পাদন হয়। বহির্বায়ু ভিতরে আকর্ষণ করিয়া নিম্নোদরে বায়ুর এবং পাকস্থলীর চাপ দিয়া মলবেগ জন্মানোর চেষ্টা সর্ব্বত্র সফলও হয় না, সর্ব্বসময়ে স্বাস্থ্য এবং বীর্য্যরক্ষণের পক্ষে হিতকারীও নহে। বরং ইহা হইতে কখনও কখনও অতিশয় উৎকট পীড়া-সমূহ উৎপাদিত হইয়া থাকে। মনকে স্থির করিবার কৌশলটী জানা থাকিলে, একমাত্র মনেরই সহায়তায় যে-কোনও অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অথবা ইন্দ্রিয়কে ইচ্ছানুযায়ী ভাবে গঠিত ও পরিচালিত করিয়া লওয়া যায়। সুতরাং মলবেগ হইবার জন্য কোনও প্রকার ঔষধাদি প্রয়োগ বা শারীরিক কসরৎ অপেক্ষা মন-মাঝির কাছেই দেহ-নৌকার বৈঠা ছাড়িয়া দেওয়া বেশী বুদ্ধিমানের কাজ। বায়ুর অনুলোম ব্যতীত কখনও কোষ্ঠ নিম্নাভিমুখী হয় না। নিম্নাঙ্গে মনঃসংযোগের দ্বারা বায়ুর অনুলোম হয়। অতএব যথাসময়ে কোষ্ঠ-নিঃসরণ হয়।

কয়েকদিন অভ্যাসের দ্বারা মানসিক শক্তির কথঞ্চিৎ উৎকর্ষ না জন্মিলে সামান্য সময়ের মধ্যে মলবেগ উপস্থিত হয় না। সুতরাং এতদবস্থায় প্রথমাভ্যাসীর কর্ত্তব্য এই যে, সে যেন কিয়ৎকাল মলদ্বারে মনঃস্থির করিবার পরে ঠিক্ নির্দ্দিষ্ট সময়টীতে মলস্থানে গিয়া বসে; মল-নিঃসরণ হউক বা না

হউক, উপযুক্ত সময় অপেক্ষা করিয়া যেন সে যথারীতি শৌচাদি সম্পাদন পূর্ব্বক প্রত্যাবর্ত্তন করে। অনেকে মল-নির্গম না হইলে জল-শৌচ না করিয়াই চলিয়া আসে। ইহা অত্যন্ত স্বাস্থ্যবিগর্হিত কার্য্য। কারণ, মলত্যাগেচ্ছায় উপবেশন-কালে অনিচ্ছা সত্ত্বেও কিঞ্চিৎ কুন্থন হয়ই। ঐ কুন্থনের ফলে নিম্নোদর, মলদ্বার ও মূত্রাশয়াদির স্নায়ু-সমূহের সঙ্কোচন ও প্রসারণ ঘটে এবং তজ্জন্য একটা উত্তেজনা সৃষ্ট হয়। শীতল জলের প্রক্ষালনে এই উত্তেজনা উপশান্ত না হইলে, ইহাই অন্যান্য পরবর্ত্তী কারণ-সমূহের সহিত মিলিত হইয়া নিরর্থক বীর্য্যক্ষরণের পন্থা উন্মুক্ত করিয়া দেয়।

মলত্যাগকালীন নিয়মাদি

অনাবৃত দেহে মলাদি ত্যাগ অবিধেয়। তাহার প্রধান কারণ এই যে, মলমূত্রাদি হইতে উত্থিত দূষিত বাষ্পাদির সহিত দেহের সংস্পর্শ ঘটিয়া দেহ অসুস্থ হইতে পারে। চক্ষু মুখ, নাসিকা, কর্ণ প্রভৃতির রন্ধ্রপথে এবং রোমকূপ দ্বারা বিষাক্ত বাষ্প দেহমধ্যে পরিগৃহীত হইয়া দেহের সমূহ অনিষ্ট-সাধন করিতে পারে। দ্বিতীয় কারণ এই যে, আমরা উপযুক্ত-রূপে লক্ষ্য না করিলেও ব্যায়ামেরই ন্যায় আহার এবং নির্হার উভয়ই শ্রম-সাধ্য। একেবারে উন্মুক্ত বায়ুতে শ্রম-সাধ্য যে-কোনও কার্য্য করিতে হইলেই সাধারণতঃ দেহ অন্ততঃ পাতলা কাপড়ে হইলেও আবৃত করা কর্ত্তব্য।

দন্তে দন্তে দৃঢ়রূপে চাপিয়া ধরিয়া মলত্যাগ করিবে। ইহাতে দন্তরোগ প্রশমিত হইবে, দন্তমূল দৃঢ় হইবে এবং শিরঃসান্নিক রোগের প্রতিষেধ জন্মিবে। মলাদি ত্যাগকালে কথা বলা, গান গাওয়া, জোরে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস ফেলা অথবা ভারাদি উত্তোলন প্রভৃতি কার্য্য সর্ব্বথা পরিত্যাজ্য।

মলত্যাগকালে জগন্মঙ্গল-চিন্তা

স্বকীয় মনকে যথাসাধ্য মলদ্বারেই সন্নিবিষ্ট রাখিয়া নিম্নরূপ চিন্তা করিতে করিতে পুরীষোৎসর্গ করিবে, যথা,- "জগৎকল্যাণে এবং আত্মমোক্ষার্থ দেহ ও মনের শক্তি-সঞ্চারের জন্য যে সকল হিতকর ও পুষ্টিকর খাদ্য আমি গ্রহণ করিয়াছিলাম, তাহার সারাংশসমূহ আমার দেহে পরিরক্ষিত হইয়াছে। যাহা কিছু দেহের পক্ষে নিরর্থক, নিষ্প্রয়োজন ও অহিতকারী ছিল, তৎসমুদায় মল-মূত্রাকারে পরিত্যক্ত হইতেছে। পুরুষানুক্রমে অথবা আমার ব্যক্তিগত ত্রুটীতে, আহারের দোষে অথবা লোক-সংসর্গ হেতু যে সকল বিষ আমার মধ্যে সংক্রামিত হইয়াছিল, এই পরিত্যক্ত মল সহকারে তাহাও নির্গত হইয়া ভবিষ্যতের বহু অনিষ্ট-সম্ভাবনা হইতে আমাকে মুক্ত করিতেছে। আর আমি যাহা পরিত্যাগ করিতেছি, তাহা আমার নিকটে একান্ত পরিত্যাজ্য হইলেও এই মলমূত্রাদির উপরে যাহাদের জীবন নির্ভর করে, সেই সকল ক্রিমি ও

কীটের জীবন-সংস্থানোদ্দেশ্যে ইহা শ্রদ্ধার সহিত উৎসর্গ করিতেছি।" এবং সংক্ষেপে বলিবে,—

"ওঁ ত্রৈলোক্যং তর্পয়ামি স্বাহা।"

হাসিতে পার, কিন্তু হাসিবার বিষয় নয়। এই মলোৎসর্গ তোমাকে লাভবান্ করিবে, শক্তিমান্ করিবে। শক্তি তপোলভ্য; ভগবানের সৃষ্ট অন্ত্যজ প্রাণীগণের কল্যাণ-কামনায় মলত্যাগ করিয়াও তুমি প্রকৃত প্রস্তাবে তপস্যাই করিলে। ফুল বেলপাতা ছাড়া তপস্যা হয় না, তাহা নহে। ভগবানের সৃষ্ট জগতের প্রত্যেকটী পরমাণুকে ভগবানের কাজে সমর্পণ করিয়া তপস্যার উদ্‌যাপন করা যায়,—তাহা পুরীষ-স্তূপই হউক, অথবা চন্দনের পাহাড়ই হউক। এই ভারতেই এখনও একটী ধর্ম্ম-সম্প্রদায় আছেন, যাঁহারা আবহমান কাল হইতে নিজেদের মৃতদেহসমূহ অগ্নিদগ্ধ বা সমাধিস্থ না করিয়া শকুনি-গৃধিনী প্রভৃতির আহারার্থ নির্জ্জন পর্ব্বত-সানুদেশে রাখিয়া আসেন। এই দেহ জীবৎকালে ধর্ম্মাচরণে ও জগৎ কল্যাণে সহায়ক হইয়াছে, জীবনান্তেও ইহা পরের আহার্য্য-সংস্থান করিয়া আত্মার সদ্গতির সহায়ক হউক, ইহাই তাঁহাদের দৃঢ় ধারণা ও বিশ্বাস। যে দেহ মাতার অসীম স্নেহে ও আদরে গঠিত হইয়াছিল, পত্নীর অপরিমেয় প্রেমে পুষ্ট হইয়াছিল, বন্ধু-বান্ধবের অতুলনীয় যত্নে রক্ষিত হইয়াছিল, যে দেহ-মধ্যে কাহারও স্নেহময় পিতা, কাহারও প্রেমময়ী মাতা, কাহারও

হাস্যময়ী সহধর্ম্মিণী, কাহারও প্রাণময় জীবন-দেবতা বাস করিতেন, সেই দেহকে শৃগাল- শকুনির আহার-বস্তু করিতে কার প্রাণে সয়? কিন্তু জগৎ-কল্যাণে তাহাও করিতে হইবে, ক্ষুধার্ত্ত শৃগাল-শকুনির জঠর-জ্বালা যদি একদিনের জন্যও নির্ব্বাপিত রাখা যায়, তাহা হইলেও এই সুকুমার সুন্দর দেহ তাহাদের জন্য অর্পণ করিতে হইবে। তাহারা নাড়ীভুড়ি ছিঁড়িয়া খাইবে, এমন ভয়াবহ দৃশ্য দেখিয়াও প্রতিবাদ করিতে পারিব না, কারণ আমার প্রিয়জন তার সর্ব্বস্ব দিয়া যে আজ পরমযজ্ঞেশ্বরের প্রীত্যর্থে মহাযজ্ঞে নিজেকে আহুতি দিয়া ধন্য ও কৃতার্থ হইতেছেন!—ইহাই যথার্থ যজ্ঞ। ক্ষুদ্র হউক, বৃহৎ হউক, প্রিয় হউক, উপেক্ষণীয় হউক, প্রশংস্য হউক, ঘৃণ্য হউক, যাহা কিছু আমার আছে, সব কিছুই জগৎ-কল্যাণ-যজ্ঞে সমর্পণ করিতে হইবে। ইহাতে কুণ্ঠা নাই, লজ্জা নাই, ভয় নাই, দ্বিধা নাই, আছে শুধু বিশ্বাস, শুধু নির্ভর, শুধু উৎসর্গের প্রেরণা ও অকপট আন্তরিকতা। সুতরাং পরিত্যক্ত মলাদিকেও কীটাদির প্রাণ-ধারণের জন্য উৎসর্গ করিতেছ, এইরূপ চিন্তা করিতে সঙ্কুচিত বা লজ্জিত হইও না।

মলত্যাগের স্থান

দেশমধ্যে জনসংখ্যার বৃদ্ধিহেতু স্থানের অকুলান ঘটায়, একই স্থানে বহু ব্যক্তির মলমূত্রাদি ত্যাগের নিয়ম প্রচলিত হইয়াছে। ইহা বহুপ্রকারেই আপত্তিজনক। কিন্তু স্বাধীনভাবে মলত্যাগের

সুবিধা না ঘটিলে, সাধারণের ব্যবহৃত মল-স্থানেই যাইতে হইবে বটে। কিন্তু যাহাতে এই স্থান নিয়মিতভাবে জল-সিঞ্চন ও মার্জ্জনাদি দ্বারা সর্ব্বদাই সুপরিষ্কৃত থাকে এবং কফ, কাসি, থুথু প্রভৃতি ফেলিয়া যাহাতে দায়িত্ব-জ্ঞানহীন ব্যক্তিরা ঐ স্থানের চতুষ্পার্শ্ব ন্যক্কারজনক করিয়া না তোলে, তার দিকে প্রখর দৃষ্টি রাখিতে হইবে। যাহারা সর্ব্বসাধারণের ব্যবহারের মলস্থানে না যাইয়া পারে, তাহাদের পক্ষে আবার কতকগুলি স্থান নিষিদ্ধ। পথে এবং গোচারণ-ভূমিতে মলত্যাগ করিও না। কারণ, পথে মলত্যাগে পথিককে অসুবিধায় ফেলা হয় এবং গাভীগণের তৃণাদি-ভক্ষণে অসুবিধা হইলে এবং দৈবক্রমে অথবা অভ্যাস-বশতঃ কোনও গাভী পুরীষ ভক্ষণ করিলে তদ্দারা তাহার দুগ্ধ বিষাক্ত হইবে। চিতাভূমি, গোরস্থান, দেবস্থান, পরিত্যক্ত আশ্রম প্রভৃতিতে মলত্যাগ করিও না, কারণ, তাহাতে পরলোক-প্রস্থিত আত্মা, দেবতা এবং সাধু-মহাপুরুষগণের প্রতি অসম্মান প্রদর্শিত হইবে। জলে অথবা জলের অতি সন্নিকটে মলত্যাগ করিও না, কারণ, তাহাতে জল দূষিত হইয়া সাধারণের স্বাস্থ্যনাশে সহায়তা করিবে, অথবা জলাদি আনয়নকালে এবং স্নানাদির সময়ে লোকেরা অসুবিধাগ্রস্ত হইবে। চষা ভূমিতে, বল্মীকস্তূপে এবং প্রাণিবিশিষ্ট গর্ত্তেও মলমূত্রাদি ত্যাগ নিষিদ্ধ। মোটকথা মল মূত্রাদি ত্যাগকালেও নিজের সুখ-সুবিধা দেখিলে চলিবে

না। আর কাহারও অণুমাত্র অসুবিধা যাহাতে না হয়, তার দিকে তোমার কড়া নজর রাখিতে হইবে। যেহেতু তুমি জগৎ-কল্যাণ-কর্ম্মী।

দণ্ডায়মান অবস্থায় মূত্রাদি ত্যাগ

পথে চলিতে চলিতে মলমূত্রাদি ত্যাগ এখনও চলিয়া উঠে নাই, কিন্তু হয়ত পাশ্চাত্যদের অনুকরণে দাঁড়াইয়া প্রস্রাব করাটা দেশের লেখা-পড়া জানা অনেক লোকেই শিখিয়াছে। পাশ্চাত্যেরা দেহের বলে ও বিজ্ঞানের বলে জগজ্জয়ী হইয়াছেন, সুতরাং তাঁহারা যাহা কিছু করেন, সবই ভাল, যেমন করিয়া করেন, তেমনই উৎকৃষ্ট, এইরূপ অন্ধ ধারণা বর্ত্তমান সময়ে অল্পবিস্তর সকলেরই মনে বদ্ধমূল হইয়া পড়িয়াছে। এই জন্যই আমাদের শাস্ত্র-গ্রন্থাদির প্রশংসা একজন ইংরেজ বা জার্ম্মাণ পণ্ডিতের মুখ হইতে বাহির হইলে আমরা আহ্লাদে আটখানা হই এবং এতদিন যে-শাস্ত্রকে কতিপয় অনুদার খৃষ্টীয় ধর্ম্ম-প্রচারকের কথায় পড়িয়া পদ-দলন-যোগ্য বলিয়া বিবেচনা করিয়াছি, তাহাই আবার মাথায় তুলিয়া নাচি। পরমুখা-পেক্ষিতা এবং আত্মবিশ্বাসহীনতা আমাদিগকে এমনই নিরেট নির্ব্বোধ এবং অপদার্থ করিয়াছে যে দেশীয় রীতিতেই কাপড়-চোপড় পরা, আহারাদি করা যে আমাদের স্বাস্থ্যের পক্ষে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, এমন কি আহারাদির নিয়ম, রন্ধনের পদ্ধতি প্রভৃতি ব্যাপারেও যে সভ্যতাভিমানী পাশ্চাত্যদের বহু বিষয় আমাদের নিকট শিখিবার আছে, এই কথা খাস্ য়ুরোপীয় সাহেবের মুখে

না শুনা পর্য্যন্ত আমরা শেরি-স্যাম্পেনের মোহ ছাড়িতে চাহি নাই। আমরা এমনই মূর্খ যে, না বুঝিয়া তাহাদের নকল করিতে গিয়া প্রতিপদে নাকাল হইতে লজ্জাবোধ করি না।

অবশ্য এমন কথা বলিতেছি না যে, যাহা কিছু বিদেশীয়, তাহাই বর্জ্জন করিতে হইবে। পাশ্চাত্যেরা নিজেদের মধ্যে যে সকল কল্যাণকর আচারব্যবহার ও রীতিনীতি গড়িয়া তুলিয়াছেন, তাহার যতটুকু সম্ভব আমাদিগকে গ্রহণ করিতে হইবে; কিন্তু সেই সময়ে মোহমুক্ত চিত্তে অপক্ষপাত ভাবে ভাল করিয়া একবার বিচার করিয়া দেখিতে হইবে যে, যখন বর্ত্তমান য়ুরোপের সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিমান্ দেশ ইংল্যাণ্ড বর্ব্বরতার যুগ অতিক্রম করিয়া যাইতে পারে নাই, এমন কি পাশ্চাত্য জাতিপুঞ্জের ধর্ম্মগুরু মহাত্মা যীশুখৃষ্ট পর্য্যন্ত যখন জন্মগ্রহণ করেন নাই, তাহারও প্রায় অর্দ্ধসহস্র বৎসর পূর্ব্বে আমাদের এই ভারতভূমি একে একে তিনটী বিরাট ধর্ম্ম-প্লাবনে বিধৌত হইয়া গিয়াছিল। দেশ-জননীর সেই সদ্যঃস্নাত সুন্দর মূর্ত্তিতে তিনটী ধর্ম্মেরই শোভার বিশিষ্টতা তৎকালীন ভারত-সন্তান-গণের সতত, সরলতা, জীব-প্রীতি, পর-ধর্ম্ম-দ্বেষ-হীনতা, সহিষ্ণুতা, সত্যবাদিতা, ন্যায়-পরায়ণতা, ধর্ম্মনিষ্ঠা ও সর্ব্বোপরি রাষ্টীয় স্বাধীনতার মধ্যে মূর্ত্তিমতী হইয়া উঠিয়াছিল। আজ পর্য্যন্ত যে অহিংসার খোঁজ বলদর্পিত পাশ্চাত্যেরা পান নাই, তাহাই এই দিনে মহামুনি শাক্য, বুদ্ধ পরমধর্ম্মরূপে প্রতি ভারতীয়ের মর্ম্মে মর্ম্মে গাঁথিয়া দিয়াছিলেন। ইহা হইল কেন?

এই পার্থক্যের কারণ কি? বেদাদি শাস্ত্রের অভ্যুদয়-যুগের সময় নির্ণয় লইয়া পাশ্চাত্য মনীষিগণের সাথে তর্ক বরং না-ই করিলাম, বৈদিক ঋষিদের মহিমার সমসাময়িকতা আলোচনার বাহিরেই বরং রাখিলাম, কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকগণ ভারতের ইতিহাসকে যেমন করিয়া গড়িয়াছেন, শিব গড়িতে বানর-গড়া গোছ সেই অসম্পূর্ণ ইতিহাসকেই সত্য বলিয়া ধরিলেও, প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তির মনের মাঝেই এই একটা প্রশ্ন জাগিবে নাকি, ভারতের সাথে পাশ্চাত্যের প্রভেদ কেন?

পাশ্চাত্যের সহিত আমাদের প্রভেদ কোথায় এবং কেন, তাহা সম্যগ্‌রূপে নির্ণয় না করিয়া আমরা পাশ্চাত্যের কিছু গ্রহণ করিতেও যেমন পারি না, নিজেদের চিরাচরিত কোনও সদাচার তেমনই হঠ্ করিয়া ছাড়িয়াও দিতে পারি না। আমাদের জাতীয়তার যাহা মেরুদণ্ড সেই মেরুদণ্ডকে বক্র না করিয়া তাহার চারিপাশে মাংসপেশী-সংযোজন আপত্তিজনক নহে, কিন্তু আয়তনে বাড়াইতে গিয়া পাশ্চাত্যের মাংসপিণ্ডের ভারে যদি আমার ভারতীয় মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া পড়ে, তবে উপায়? তাই, গ্রহণ এবং বর্জ্জনে বিচার প্রয়োজন। একজন বড়মানুষ একরূপ করিয়াছেন বলিয়াই গড্ডলিকা-প্রবাহের ন্যায় তাহার অনুসরণ করিলে চলিবে না। প্রতিভাবানের দোহাই যথেষ্ট দেওয়া যায়, কিন্তু পাদ্রী কে° এম° ব্যানার্জ্জি, ডব্‌লিউ° সি° ব্যানার্জ্জি, মনোমোহন ঘোষ, টি° পালিত,

ডাক্তার গুডিভ চক্রবর্ত্তী এবং মাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রভৃতির ন্যায় মনস্বী ব্যক্তিরাও বিলাতি ধরণে আহার করিতেন বা পরিচ্ছেদ পরিতেন বলিয়াই জাতীয়তার আদালতে ইঁহাদের এই নজির প্রামাণ্য বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না। ইহারা বহু প্রকারে জাতির গৌরব ও সম্পদ বৃদ্ধি করিয়া থাকিলেও ইঁহাদের সব কিছু নির্ব্বিচারে অনুকরণীয় নহে।

তোমাকে মনে রাখিতে হইবে যে, ভারতীয় সদাচার পরিত্যাগ করিয়া পাশ্চাত্য সদাচার গ্রহণ সকল সময় কল্যাণ-কর নহে। অনেক পাশ্চাত্য সদাচার আমাদের পক্ষে অনাচার বা ব্যভিচার। সুতরাং বসিয়া মূত্রত্যাগের যে চিরন্তনী রীতি আমাদের চলিয়া আসিয়াছে, তাহা পরিত্যাগ করা নিষ্প্রয়োজন। তবে সহর-অঞ্চলের সকলের ব্যবহারের জন্য যে সব মূত্রাগার আছে, সেখানে দাঁড়াইয়া প্রস্রাব করাই উচিত, নতুবা কোনও প্রকারে পূর্ব্বজন-পরিত্যক্ত মূত্রের সংস্পর্শ ঘটিলে অপরের ঔপসর্গিক মেহ, উপদংশ প্রভৃতি কুৎসিত কদর্য্য ব্যাধি নির্ম্মল-চরিত্র নিরপরাধ ব্যক্তির মধ্যেও সংক্রামিত হইবার সম্ভাবনা। এইখানে যে দাঁড়াইয়া প্রস্রাবের সমর্থন করিতেছি, তাহা ভারতীয় জীবন যাপনেয় রীতি-নীতি ভাঙ্গিবার আগ্রহেও নয় অথবা পাশ্চাত্যের সুলভ অনুকরণের মোহেও নয়; একমাত্র আত্মরক্ষার্থ, নিছক প্রাণের দায়ে।

পাশ্চাত্যের "সুলভ" অনুকরণ বলিয়াছি দেখিয়া হয়ত চটিবে। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে আমরা পাশ্চাত্যের সহজানুকরণীয়

আচরণেরই নকল করিতেছি। দীর্ঘকাল যাহারা পরাধীন, তাহাদের পক্ষে এইরূপ সুলভ অনুকরণের মোহ কতকটা স্বাভাবিক। কিন্তু স্বাভাবিক বলিয়া হাল ছাড়িয়া দিলে আজ আমাদের চলিতেছে কৈ? পাশ্চাত্য তাঁর জাতীয় আত্ম-সম্মান অক্ষত অটুট রাখিবার জন্য যেমন পতঙ্গ-পালের মত রণাগ্নিতে আত্মাহুতি দিতে পারেন, আমাদের ন্যায় ক্লীব, পঙ্গু, পশুর মত লুক্কায়িত রহিয়া প্রাণ বাঁচাইয়া পাশ্চাত্য যেমন গৃহনারীর সম্ভ্রম বাঁচাইবার জন্য মৃত্যুকে অগ্রাহ্য করেন, দেশের গৌরব বাড়িবে জানিয়া পাশ্চাত্য যেমন মেরুর শীতলতা, মরুর উষ্ণতা, অরণ্যের হিংস্রতা ও আল্পস্‌-হিমাচলের বাধা-বিপত্তির মধ্যে অনায়াসে প্রাণদান করেন, তেমন করিয়া যে দিন আমরা পাশ্চাত্যের মত করিতে পারিব, সেই দিনই একটা দুর্লভ অনুকরণ হইবে এবং সেই অনুকরণ আমাদের জাতীয় মেরু-দণ্ডকে শক্ত করিবে। কারণ, পাশ্চাত্যের এইসব মানবোচিত গুণ ও বীরোচিত অধ্যবসায় আমাদেরও ছিল, কিন্তু আমরা আত্মবিস্মৃত হতভাগ্য জাতি, সেই গৌরবের বীরত্ব-গাথা ভুলিয়া গিয়াছি। আরও দুর্ভাগ্য এই যে, সেই পুরাতনী কাহিনী স্মৃতিতে আনিবার আমাদের আগ্রহ নাই।

অতীত গরিমা স্বপনের মত গিয়াছি ভুলিয়া হায়,
তাই না পথিক একাকী পাইয়া মুখে থুথু দিয়া যায়!
অতীত কাহিনী লুটিয়া ধুলায় করিছে আর্ত্তনাদ,
আমরা তখন ক্লাব-ঘরে বসি' করি পর-পরিবাদ।
ইতর কুৎসা, জঘন্য রুচি, কদর্য্য মতামত
অজ্ঞাতসারে করিছে রচনা চির-নরকের পথ।

৪

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

মূত্র-ত্যাগের নিয়ম

মূত্রত্যাগকালে মুখবিবর জলপূর্ণ করিয়া একটু পরে পরে একবার মূত্রাবরোধ করিয়া অতি সামান্য দুই তিন সেকেণ্ড থামিয়া থামিয়া প্রস্রাব করিলে তাহাতে একদিকে যেমন উদরী কুরণ্ড রোগের প্রতিষেধ হয় বলিয়া কথিত আছে, অপর দিকে তেমন মূত্রনালীর পেশীসমূহ ক্রমশঃ দৃঢ়তা লাভ করিয়া ইন্দ্রিয়গত দৌর্ব্বল্যের প্রতিবন্ধকতা করে। শরীরের প্রত্যেক অংশেরই বিশিষ্ট প্রকারের ব্যায়াম আছে, অভ্যাসের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নিজ নিজ প্রয়োজনানুরূপ পরিপুষ্টি লাভ করে। এই ভাবে প্রস্রাব করিলে জননেন্দ্রিয়ের ব্যায়াম নিরাপদে হয়। জননেন্দ্রিয়ের অন্যান্য বহুবিধ ব্যায়াম আছে, যাহা এতই বিপদ্-বহুল যে, যার-তার মুখে একটা কথার কথা শুনিয়া অথবা যা-তা একটা পুস্তকে পড়িয়া অভ্যাস করা অন্যায়। বই পড়িয়া যোগাভ্যাস করিতে যাইয়া বহুলোক উৎকট ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়াছেন এবং দীর্ঘকাল অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিয়া অকালে অনর্থক ভাবে ইহ-লীলা সাঙ্গ করিয়াছেন। এই জন্য জননেন্দ্রিয়ের অপর কোনও ব্যায়ামের বিষয় এখানে উল্লেখ করিলাম না।

গুহ্যদেশে মৃত্তিকা লেপন

মলত্যাগ করিয়া সুপরিষ্কৃত আবর্জ্জনাহীন বিশুদ্ধ মৃত্তিকা গুহ্যদেশে লেপন পূর্ব্বক বারংবার জলশৌচ করা কর্ত্তব্য। বর্ত্তমান সময়ে মলদ্বারে মৃত্তিকালেপনের প্রথা প্রায় উঠিয়া গিয়াছে, বলিতে হইবে। ইহাতে যে আমাদের কোনও কল্যাণ হইয়াছে, এমন কথা বলিতে পারি না। বরং আজিকার দিনে ঘরে ঘরেই অর্শোরোগী দেখা যাইতেছে। নিত্য মৃত্তিকালেপীর কখনও অর্শঃ হইতে পারে না এবং যদিও বা কাহারও অর্শরোগ থাকিয়া থাকে, তবে দীর্ঘকাল ধৈর্য্য সহকারে উৎকৃষ্ট মৃত্তিকালেপনের ফলে তাহা অন্তর্হিত হয়। কিন্তু যে-মৃত্তিকা কেঁচো, উই পোকা ইন্দুর প্রভৃতির দ্বারা উৎক্ষিপ্ত হইয়াছে, যাহাতে কুকুর, বিড়াল বা শৃগালাদিতে আঁচড় দিয়াছে বা মলমূত্রাদি পরিত্যাগ করিয়াছে, যে মাটিতে কোনও প্রাণীর মৃতদেহ বা দেহাংশ পতিত হইয়াছে, যে মাটিতে মৃত বা জীবিত কীটাদি রহিয়াছে, যাহা সজল সকর্দ্দম অথবা যাহা অপরের শৌচাবশিষ্ট, এমন মৃত্তিকা দ্বারা শৌচ করা কখনও কর্ত্তব্য নহে। বরং একমাত্র জলদ্বারা শৌচ-বিধান ভাল। যাহাতে সময় মত উপযুক্ত মৃত্তিকা পাইবার কোনও বিঘ্ন না হয়, তার জন্য কঙ্করহীন মৃত্তিকা আনিয়া ক্রমাগত কয়েক সপ্তাহ রৌদ্রে দিয়া ঝাঁ ঝাঁ করিয়া শুকাইয়া লইলেই তন্মধ্যস্থ যাবতীয় দোষ অন্তর্হিত হইবে।

মূত্র-ত্যাগান্তে জল-শৌচ

প্রস্রাব করিবার পরেও শৌচ বিধেয়। তবে সেই সময়ে মৃত্তিকা প্রয়োজনীয় নহে। প্রতিবার প্রস্রাবের পরেই শীতল জলের দ্বারা মূত্রদ্বার উৎকৃষ্টরূপে ধৌত করা কর্ত্তব্য। স্বপ্নদোষাদিজনিত বীর্য্য-পাতান্তে জননেন্দ্রিয়ের শৌচ-বিধানে শৈথিল্য করা কিছুতেই কল্যাণকর নহে। যাহারা মূত্র-ত্যাগাদির অন্তে শৌচ করে না, তাহাদের মেঢ্র দেশে ক্লেদাদি সঞ্চিত হইয়া একপ্রকার সূক্ষ্ম কীট জন্মে। ইহারা সাধারণ চক্ষুর অগোচরে ক্ষত উৎপাদন করিয়া লিঙ্গনালে একপ্রকার সুড় সুড়ির সৃষ্টি করে। ফলে মুহুর্মুহুঃ জননেন্দ্রিয়ের উত্তেজনা হইয়া সর্ব্বদাই শরীরস্থ বীর্য্যরাশি স্থানভ্রষ্ট হইতে থাকে। সুতরাং ব্রহ্মচর্য্য-ব্রতাভ্যাসীর পক্ষে প্রস্রাব করিতে জল নেওয়া একটা অতি বড় প্রয়োজনীয় নিয়ম বলিয়া জানিতে হইবে।

অনেকে মনে করে যে, একমাত্র ব্রাহ্মণেরাই প্রস্রাবে জল লইতে অধিকারী, কিন্তু ইহা অজ্ঞ ব্যক্তির অন্ধ কুসংস্কার মাত্র। কেহ যদি এইরূপ অশ্রদ্ধেয় যুক্তি লইয়া বিরুদ্ধে বুঝাইতে আসে, তাহার কথা শ্রবণ-মাত্রেই অগ্রাহ্য করিবে। প্রস্রাবে জল লওয়া যে কত বড় কল্যাণবাহী বিধি, তাহা মহাত্মা হজরৎ মহম্মদ সম্যগ্‌রূপে জানিতেন বলিয়া প্রত্যেক মুসলমানদের পক্ষে ইহা অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। ইহাতে

ইন্দ্রিয়ের অস্বাভাবিক উত্তেজনা-প্রবণতা নষ্ট হয় এবং তদ্ধেতু মস্তিষ্ক শীতল ও স্নিগ্ধ রহে।

দন্ত-ধাবন

শৌচাদি-সমাপনানন্তর করতল ও পদতল উত্তমরূপে ধৌত করিয়া মুখ ও দন্তাদি ধাবন করিবে। যাহাদের দাঁতের মাড়ি কচি রহিয়াছে, তাহাদের পক্ষে দন্ত-কাষ্ঠ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য নহে। বিশুদ্ধ শুষ্ক এটেল মাটী, কর্পূর ও ফিটকিরি মিশ্রিত ফুলখড়ি চূর্ণ প্রভৃতি অথবা অন্য কোনও প্রকারের দন্ত-শোধক বা দন্তরক্ষক মঞ্জন ব্যবহার করাই তাহাদের উচিত। যাহাদের দন্ত-মাংস উপযুক্তরূপে দৃঢ় হইয়াছে, তাহাদের পক্ষে কষায়তিক্তাদি, যে রস যাহার স্বাস্থ্যের অনুকূল এবং যে রস যে ঋতুতে অধিকতর উপযোগী, সেই রস-বিশিষ্ট, উপযুক্ত-রূপ, অনতিস্থূল ও অনতিসূক্ষ্ম, সরল গ্রন্থিশূন্য দন্ত-কাষ্ঠ ব্যবহার করা উচিত। সাধারণতঃ নিম্বকাষ্ঠই দন্তনের পক্ষে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। মুখদৌর্গন্ধ, মুখবিরসতা, বমনোদ্বেগ, পিপাসা, অরুচি ও মুখের সর্ব্ববিধ ক্ষতাদি দূর করিতে ইহাদের শক্তি প্রায় অপ্রতিদ্বন্দ্বী। দন্ত-ধাবন-কালে দন্ত-পংক্তির বহির্ভাগ, ভিতরের দিক্ এবং জিহ্বামূল যত্নের সহিত পরিষ্কার করিবে। জিহ্বা পরিষ্কার করিবার জন্য জিব্‌ছোলা ব্যবহার করা সুবিধাজনক। দন্তধাবন সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে হওয়াই উচিত।

আমাদের দেশের ছেলে-ছোক্‌রারা আজকাল আর দাঁত

মাজিবার সময় পান না। অনেক বেলায় ঘুম হইতে উঠিয়া তারপরে তাড়াহুড়া করিয়া এক গণ্ডূষ জল দিয়া কোনো ক্রমে একটু কুল্‌কুচা করিয়া গামোছার এক কোণা দিয়া চক্ষু দুইটী একটু মুছিয়া প্রাতঃকালীন চায়ের বৈঠকে বসিয়া যান। বলা বাহুল্য, এইসব জাহান্নমে যাইবার প্রকট লক্ষণ। দাঁতের গোড়ায় ময়লা জমিয়া যে বিষ সঞ্জাত হয়, তাহা সান্নিক প্রভৃতি উৎপাদন করিয়া ত' মাসে দুইবার করিয়া ব্যতিব্যস্ত করেই, তার উপরে আর এক বিপদ এই যে, খাদ্যদ্রব্যের সাথে দাঁতের আবর্জ্জনাগুলি মিশিয়া পরিপাক-ক্রিয়ারও ব্যাঘাত ঘটায়। নকল দাঁতে দেশ ছাইয়া যাইতেছে, তাহার দুঃখ করিই না কিন্তু এই যে বালক-বৃদ্ধ, স্ত্রী-পুরুষ সকলেই পেটরোগা হইয়া পড়িল, তার উপায় কি করি?

তাই, আজ তোমাদিগকে এমন কি দন্ত-ধাবনের মত সামান্য একটী নিয়মও নিষ্ঠার সহিত প্রতিপালন করিতে হইবে। ক্ষুদ্র বৃহৎ প্রত্যেকটী মঙ্গল-বিধানকে যদি ষোল-আনা শ্রদ্ধার সহিত আমরা গ্রহণ না করিতে পারি, তাহা হইলে এই ধ্বংসোন্মুখ জাতির আর অভ্যুদয় নাই, মৃত্যু একেবারে অনিবার্য্য। শরীর ও স্বাস্থ্য সংরক্ষণে ধর্ম্মান্ধের অপেক্ষাও অধিকতর গোঁড়া হইয়া চলিতে হইবে। আর, দন্তধাবনকে এমন তুচ্ছই বা বলি কি করিয়া? য়ুরোপের প্রথম মহাযুদ্ধে সভ্যতা রাক্ষসীর ক্ষুধানলের ইন্ধন যোগাইবার জন্য যখন

পৃথিবীর প্রায় সকল স্বাধীন ও পরাধীন দেশের সৈনিকগণ বিভিন্ন রণাঙ্গনে সমবেত হইয়াছিল, তখন দেখা গিয়াছিল যে, ভারতীয় শিখ-সৈন্য এবং জার্ম্মান সৈন্যেরা অল্প ঔষধে অল্প সেবা ও শুশ্রূষায় কঠিন কঠিন অস্ত্রাঘাত হইতে দিব্যি সারিয়া উঠে; আর বৃটিশ ও ফরাসী সৈনিকদের সামান্য সামান্য ক্ষত অল্প কয়েকদিনের মধ্যে পচন ধরিয়া যায়। আর দেখা গিয়াছিল যে, আমেরিকান্ চিকিৎসকদের চিকিৎসাধীনে যে সব বৃটিশ ও ফরাসী সৈন্যদিগকে ন্যস্ত করা হইয়াছিল, তাহারা যত শীঘ্র নিরাময় হয়, ইংরেজ ও ফরাসী চিকিৎসকগণের চিকিৎসাধীন রুগ্নগণ তত শীঘ্র আরোগ্য লাভ করে না। পরে অনুসন্ধানে বাহির হইল যে, যে সকল শিখ্ ও জার্ম্মাণ সৈনিক যুদ্ধে আহত হইয়াছিল, তাহারা নিত্য দন্ত-ধাবনাভ্যাসী ছিল এবং আমেরিকান্ চিকিৎসকগণ চিকিৎসাকালে তাহাদের অধীনস্থ বৃটিশ ও ফরাসী রোগীদের দন্ত-পংক্তি অধিকাংশ স্থলেই নিজ নিজ হস্তে পরিষ্কৃত করিয়া দিতেন। ইহাতে রোগীদের ভোজ্য দ্রব্য উৎকৃষ্টরূপে চর্ব্বিত হইতে পারিত এবং ভুক্ত দ্রব্য পাকস্থলীতে যাইয়া অতি সহজে পরিপাক পাইতে পারিত। য়ুরোপের নাজির না পাইলে কথাটা একান্তই উপেক্ষণীয় বিবেচিত হইতে পারে বলিয়া একটা নজির দেখাইলাম।

ভুক্তদ্রব্য পরিপাকের শক্তির সহিত জাতির ভবিষ্যতের সম্বন্ধ

তোমরা মনে রাখিও যে, একটা জাতির সমগ্র ভবিষ্যতের অনেকখানি তাহার ভুক্তদ্রব্য পরিপাক করিবার শক্তির উপরে নির্ভর করে। দুর্ব্বলদেহ, কুণ্ঠিত-স্নায়ু, অপূর্ণ-মস্তিষ্ক, অক্ষম মানুষ দিয়া দেশের যে ভবিষ্যৎ গড়া যাইবে, তাহা গৌরবকে আনয়ন করিবে না, মৃত্যুকে—শোচনীয় মৃত্যুকেই আমন্ত্রণ দিবে। অদূর ভবিষ্যতের সেই হৃদয়-বিদারক নিদারুণ দৃশ্যের কথা মনে মনে একবার কল্পনা করিয়া নিজের কর্ত্তব্য অবধারণ কর। জগতের প্রত্যেক জাতি নিজ নিজ মাংস-পেশীর শক্তি বাড়াইতেছে, কেহ অলস হইয়া বসিয়া নাই, নিজের অসামর্থ্য বা অনবধানতার সুযোগে অপরে তাহাদের মুখের গ্রাস কাড়িয়া লউক, এমন অবসরটুকু দিতে কেহ রাজী নয়, আর তোমরাই কি শুধু গোলাভরা ধান থাকিতে না খাইয়া মরিবে? প্রতি-যোগিতার ক্ষেত্রে পরাজিত হইয়া তোমরা কি চিরদিনই পদ-বিদলিত হইবে? ওগো ভাই! চক্ষু থাকিতে আর কতকাল অন্ধ থাকিবে? কর্ণ থাকিতে আর কতকাল বধির রহিবে? অসাবধানতায় সাতরাজার ধন এক মানিক হারাইয়াছ, ঔদাসীন্যে তোমার অচল প্রতিষ্ঠাকে বিচলিত করিয়াছ, ক্ষুদ্র স্বার্থপরতায় মজিয়া শ্রেষ্ঠ স্বার্থকে অতল সলিলে বিসর্জ্জন দিয়াছ, আর কত অধঃপাতে যাইবে? আজ তুমি উঠ ত'

ভাই! আত্ম-কল্যাণে, দেশ-কল্যাণে, জগৎ-কল্যাণে একবার অভ্যুত্থান লাভ কর। হে সিংহ-শাবক, শৃগাল-শিশুর উপাসনা আর করিও না, বুদ্ধিমানের বুদ্ধি ধার করিও না; চতুর ব্যক্তির চতুরতার আশ্রয় লইও না; অজেয় পরাক্রমে, অটল সাহসে, অপ্রতিম ধৈর্য্যের সহিত অগ্রসর হও। প্রতিযোগিতার রণাঙ্গনে আজ তোমাকে সর্ব্বজয়ী হইতে হইবে, সকল প্রতিপক্ষকে নতশির করিতে হইবে, নতুবা তোমার যে উদ্ধার নাই! তোমাকে আজ বাঁচিতেই হইবে, বাঁচিবার মত বাঁচিতে হইবে, যে বাঁচার গৌরব সশস্ত্র জগতের বুকের উপর নিরস্ত্র ভাবে দাঁড়াইয়াও সগর্ব্বে করিতে পার, যে বাঁচা বাঁচিলে জাতি-সমষ্টির প্রত্যেকটী ব্যষ্টি তোমার সেবায় হইবে তুষ্ট, পুষ্ট, সঞ্জীবিত, যে বাঁচা বাঁচিলে অভিমন্যুর মত সপ্তরথিবেষ্টিত হইয়া মরিয়া মরণেরও গৌরব করিবার যোগ্য হইবে, তেমন বাঁচা আজ তোমাকে বাঁচিতে হইবে। তাই, আজ চাই তোমার বাহুতে দুর্জ্জয় শক্তি, হৃদয়ে অসীম বল, দেহে অপূর্ব্ব কৃচ্ছ্র-সহিষ্ণুতা, মনে অদম্য উদ্দাম উৎসাহ-প্রেরণা। আজ দেশকে ভালবাস, জাতিকে ভালবাস, পতিতের জন্য সহানুভূতিতে গলিয়া যাও, ব্যথিতের জন্য অন্তরের অন্তরে অনুভব কর, তবেই তোমার ভিতরে শক্তির সহস্র নির্ঝরিণী উৎসারিত হইয়া উঠিবে, সামর্থ্যের বাসুকী সর্প সহস্র ফণা তুলিয়া সোল্লাসে নাচিয়া উঠিবে। প্রেম সর্ব্বজয়ী, প্রেম সর্ব্বগ্রাসী। আজ তুমি প্রেমিক হও, তোমার জয় সর্ব্বত্র হইবে, তোমার প্রেম বিশ্বকে গ্রাস করিবে এবং তোমার অথবা তাহার পৃথক অস্তিত্বকে সমূলে বিনাশ করিয়া তোমার আত্মমোক্ষ ও জগদ্ধিতের পন্থা নিষ্কণ্টক করিয়া দিবে।

——

সপ্তম পরিচ্ছেদ

নয়নে জল-তর্পণ

হস্ত পদ-মুখাদি প্রক্ষালন-কালে মুখপূর্ণ জল লইয়া গণিয়া গণিয়া সপ্তবিংশতিবার চক্ষে জল দেওয়াতে চক্ষুর দৃষ্টিশক্তি বর্দ্ধিত হয় এবং মনঃসংযমের সামর্থ্য বাড়ে। জল দিবার সময়ে নিঃশ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ থাকা প্রয়োজন, কিন্তু জলের ঝাপ্‌টা যাহাতে ঠিক চক্ষু-ডিম্বের উপরে না পড়িয়া ভ্রূ-যুগের মধ্যস্থলে পতিত হয়, সেই দিকে লক্ষ্য রাখিও। চক্ষু-ডিম্বে ঝাপ্‌টা লাগিলে বৃথা চক্ষু আহত হইবে এবং বিবিধ চক্ষু পীড়ার উৎপাদন করিবে। এইরূপ জলের ঝাপ্‌টা দেওয়ার সময়ে ভ্রূযুগমধ্যে ওঁকার, চন্দ্র, সূর্য্য, নক্ষত্রাদি, নিজ ইষ্ট-জ্যোতিঃ প্রভৃতি অধিকারানুযায়ী দীপ্তিশালী পদার্থের বা বিষয়ের চিন্তা করা বিশেষ হিতকর। হউক সামান্য সময়ই, কিন্তু প্রতিদিনই সামান্য সময় করিয়া একটী নির্দ্দিষ্ট কল্যাণবাহিনী প্রক্রিয়ায় ব্যয় করিলে অণুর অণু করিয়া দিন দিন যে সাধন হইতেছে, বিশ্বাসের শিথিলতা বা নিষ্ঠা-নির্ভরের অল্পতা প্রযুক্ত তাহার গতি মাঝে মাঝে রুদ্ধ হইয়া না গেলে উহাই একদিন হিমাচল-মিত গগনস্পর্শী পুঞ্জ হইয়া দাঁড়াইবে। তারপর শুধু যে এই সময়েই এইরূপ জলের ঝাপ্‌টা দিবে, তাহা নহে। যখনই যে কোনও কারণেই মুখহস্তাদি প্রক্ষালন করিতে হউক না কেন,

তখনই অন্ততঃ সাতবার করিয়া ঝাপ টা দিতে চেষ্টা করিবে। প্রত্যেকবার ঝাপ্‌টা দিবার সময়ে রবিসোমাদি গ্রহের নাম উচ্চারণ এবং তাহাদের জ্যোতির্ম্ময় রূপ চিন্তা করিলে, তাহাতেও কল্যাণ আছে। যাঁহারা নিজ জীবনের শ্রেষ্ঠ পন্থা ইষ্টমন্ত্রের মধ্যে লাভ করিয়াছেন, তাহাদের পক্ষে রবি-সোমাদি গ্রহ বা অশ্বিনী, ভরণী প্রভৃতি নক্ষত্রপুঞ্জের নামোচ্চারণের কোনও প্রয়োজন করে না। ইষ্টমন্ত্রই শ্রেষ্ঠ মন্ত্র, ইষ্টজ্যোতিঃই শ্রেষ্ঠ জ্যোতিঃ, ইহার উচ্চারণই শ্রেষ্ঠ উচ্চারন, ইহার ধ্যানই শ্রেষ্ঠ ধ্যান। কোহিনূর মহামণি যাহার করধৃত, সোণার মোহর অপরের কাছে আদরের হইলেও তাহার কাছে তুচ্ছ, অতীব তুচ্ছ। কল্পতরুকে যে পাইয়াছে, মলয়ের চন্দন-বনকেও সে অগ্রাহ্য করে।

ক্ষুদ্র হউক, বৃহৎ হউক দৈনন্দিন প্রত্যেকটী কার্য্যের মধ্যে পরমানন্দধাম পরম-পুরুষকে মনে রাখিতে হইবে। ইহাই হইল আসল কথা। আহারে, বিহারে, স্বপ্নে, জাগরণে, বিশ্রামে, অধ্যয়নে, ভ্রমণে, অবস্থানে, সব সময়ে নিজ জীবনের লক্ষ্যকে নিজ জীবনের শ্রেয়ঃকে, নিজ জীবনের সারাৎসারকে মনে রাখিতে হইবে, ইহাই যথার্থ ব্রহ্মচর্য্য। কোন্ মহাকার্য্য সাধিতে দুর্লভ মনুষ্য জন্ম লাভ করিয়া আসিলাম, প্রকৃতির যে পরাধীনতা স্বেচ্ছায় স্বীকার করিয়া লইয়া আমি সেই মহাকার্য্য সাধন সক্ষম হইয়াও অক্ষম হইয়া রহিয়াছি, সেই পরাধীনতা

ঘুচাইয়া কেমনে আমার জন্মকর্ম্ম সার্থক করি, তার কথাই নিত্যকাল অন্তরে জাগরূক রাখিয়া প্রতিকার্য্যে আমার মনকে সংযত এবং সংযুক্ত করিতে হইবে। সর্ব্বকালে নিজেকে রোগমুক্ত রাখিয়া অবিচ্ছেদ আত্মচিন্তা বা আত্মগঠন বা আত্মবিকাশই সাধনা। এই সাধনাই ব্রহ্মচর্য্য, তাই ব্রহ্মচর্য্যের নিয়ম পালন করিতে গিয়া অনেক খুটিনাটী পালন করিতে হয়।

ব্যায়ামাভ্যাস

শৌচাদি শেষ করিয়া নিয়মিত ভাবে ব্যায়াম করিবে। একটী নির্দ্দিষ্ট নিয়ম করিয়া অক্ষরে অক্ষরে তাহা প্রতিপালন না করিলে ব্যায়ামে তেমন উপকার দেখা যায় না। আজ পাঁচটায়, কাল দশটায়, আজ প্রাতে, কাল বৈকালে, কোনও দিন দুপুরে আর একদিন হয়ত রাত্রি দুপুরে আরম্ভ করিলাম, ইহাতে দেহের বা মনের কল্যাণের আশা কম, এমন কি অকল্যাণও হইতে পারে। আহার, নিদ্রা, ব্যায়াম এবং উপাসনা এই চারিটী বিষয়ে সময়ের নিয়ম রক্ষা করিয়া না চলিলে, ইহাদের কল্যাণকারিণী শক্তি হ্রাস-প্রাপ্ত হয়। ব্যায়াম এবং উপাসনা সম্বন্ধে ইহা ছাড়াও একটী মহাপ্রয়োজনীয় কথা আছে। আজ ডাম্বেল, কাল মুগুর, পরশ্ব হয় দেশী কসরৎ আজ একজনের উপদেশ অনুসারে এক প্রকারের উপাসনা, কাল আবার আর এক জনের কথায় আর এক প্রকারের উপাসনা, পরশ্ব তৃতীয় প্রকারের উপাসনা করিতে

আমি অবশ্যই পারি, এই বিষয়ে আমার স্বাধীনতা হরণ করিবে কে? কিন্তু ইহাতে দেহেরও পুষ্টি হয় না, মনেরও নির্ম্মলতা সাধিত হয় না। নিত্য নিত্য পদ্ধতি পরিবর্ত্তন করিয়া নগরে নগরে দীপশিখা জ্বালিয়াও হায়! হায়! তুমি যে তিমিরে সেই তিমিরেই থাকিবে। শক্তির ছটা তোমার দেহে বিচ্ছুরিত হইবে না, জ্ঞানের জ্যোতিঃ তোমার চিত্তকে আলোকিত করিবে না। কেবল এদিক সেদিক ঘুরিয়া, সকল দুয়ারে কপাল খুঁড়িয়া পরিশ্রান্তই হইবে, পিপাসার শান্তি-অমিয় পান করিতে পারিবে না। তাই, ইহাতে একনিষ্ঠা প্রয়োজন। যদি ডাম্বেলই ধরিলে, তবে ডাম্বেলের একেবারে চূড়ান্ত উন্নতি করিয়া তারপরে ছাড়িবে। ডাম্বেল, মুগুর, বট্‌গিরি, জাপানি জুজুৎসু, মুষ্টিযুদ্ধ, কুস্তি বা অপর কোনও ব্যায়ামের মধ্যে কোন্‌টী বা কোন্‌গুলি তোমার পক্ষে শ্রেষ্ঠ হইবে, তাহা তুমি নিজের রুচি, প্রকৃতি, সামর্থ্য ও সুযোগ বিবেচনা করিয়া স্থির করিও। কিন্তু যেইটিকে বা যে কয়টিকে একবার ধরা হইবে, সেইটীকে বা সে কয়টিকে যেন সহজে আর ছাড়া না হয়। শরীরের গঠন বা কৃশতা-স্থূলতার উপরে ব্যায়াম-পদ্ধতি নির্ব্বাচন বিশেষভাবে নির্ভর করে। ব্যায়াম-প্রণালী জীবনের উদ্দেশ্যেরও সম্পূর্ণরূপে অপেক্ষা রাখে। যে ব্যক্তি ব্যায়ামলব্ধ শক্তির দ্বারা দীন-দরিদ্রের দুঃখ ঘুচাইবেন, বিপন্নের বিপন্মুক্তি সাধিবেন, নিপীড়িত-লাঞ্ছিতের বেদনার অবসান ঘটাইবেন,

অথবা যে ব্যক্তি দৈহিক শক্তির প্রদর্শনী করিয়া শুধু উদরান্ন যোগাইবেন কিম্বা যে ব্যক্তি দৈহিক শক্তি দ্বারা পর-পীড়ন, পরস্বাপহরণ, অপরের স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ প্রভৃতি পশু-জনোচিত কার্য্য করিবে, এই তিন জনের ব্যায়াম-পদ্ধতি এক হইতে পারে না। ভগবচ্চিন্তা-পরায়ণের পক্ষে দুই একটী আসন-প্রাণায়ামই যথেষ্ট, কর্ম্মীর পক্ষে তাহাই যথেষ্ট নহে, এমন কি আসন-প্রাণায়াম সব সময় তাহার প্রয়োজনও নহে। একজন গামা, গোবর বা রামমূর্ত্তির যে ব্যায়াম আবশ্যক, একজন বিবেকানন্দ, বিজয়কৃষ্ণ বা রামতীর্থের সেই ব্যায়াম আবশ্যক নহে। সুতরাং নিজ জীবনের লক্ষ্যকে বিশেষভাবে বুঝিয়া ব্যায়াম-প্রণালী নির্ব্বাচন করিবে এবং জীবনের লক্ষ্য তোমার যাহাই হউক, সবল, সুদৃঢ় ও স্বাস্থ্যবান্ দেহ যে সকলেরই প্রয়োজন, একথা তোমাকে মনে রাখিতে হইবে।

অনেকে বলিয়া থাকেন, দেশের বর্ত্তমান দরিদ্রাবস্থায় ডন-কুস্তি প্রভৃতি দ্বারা ব্যায়াম না করিয়া মাটী কোপাইয়া শাক-সব্জীর বাগান করিয়া ব্যায়ামের কাজ সারা উচিত। কথাটা একান্ত অশ্রদ্ধেয় নহে। শুধু দরিদ্র বা মধ্যবিত্ত লোকদের কেন, ধনি সন্তানগণও যদি প্রত্যহ নিজ বাগানের মাটী নিজ হাতে কোপান, তাহা হইলে ধনিসুলভ বৃথা আত্ম-গরিমা হ্রাস হইয়া ব্রহ্মচারি-ভূষণ বিনয় এবং দীনতা (হীনতা নহে) তাহার মধ্যে স্থান পায়। ইহা একটা মস্ত বড় লাভ। ব্রহ্মচারীর উন্নতির

হিসাবের খাতায় এই দুইটী গুণকে জমার ঘরে লিখিতে পারিলে, একটা রাজ্য লাভের চেয়েও অনেক বেশী সম্পদ আসিল। কিন্তু ব্যায়ামের হিসাবে এই সব লাভজনক শ্রম কিছুই নহে, এমন কি ক্রীড়াদিও তাহাদের আনন্দোল্লাস-সঞ্চারিত্বটুকু বাদ দিলে নিয়মিত নির্দ্দিষ্ট ব্যায়ামের অনেক পশ্চাতে গিয়া কুণ্ঠিত বয়ানে দাঁড়ান।

তোমার ভিতরে অনন্ত শক্তি রহিয়াছে। তাহাকে জাগ্রত করিতে পারিলে বিশ্বজগতে তোমাকে প্রতিরোধ করিবার কেহ নাই, সেই মহাশক্তি তোমার ভিতরে সুপ্ত রহিয়াছে বলিয়া তুমি মনে করিতেছ, তুমি দুর্ব্বল, তুমি অধম, তুমি অক্ষম। আবার তুমি তোমাকে হেয়, ঘৃণ্য ও অবনত মনে করিতেছ বলিয়াই তোমার ভিতরের শক্তি সিংহ-গর্জ্জনে জাগিয়া উঠিতে পারিতেছে না। যেই মুহূর্ত্তে তুমি মনে প্রাণে জানিবে, তুমি দুর্ব্বল নহ, তুমি অধম নহ, তুমি অক্ষম নহ, ঠিক সেই মুহূর্ত্তে তোমার অন্তরস্থ আত্মশক্তির গর্জ্জন-হুঙ্কারে বজ্র-পতনের ঘোর-নির্ঘোষও লজ্জায় শঙ্কায় নীরব হইবে।

এই সুপ্তশক্তিকে জাগ্রত করিবার জন্য যুগে যুগে মানবগণ যে পদ্ধতিবদ্ধ আয়াস-সমূহ অবলম্বন করিয়াছেন, তাহারই নাম ব্যায়াম। এই অনায়াসে মনের সংযোগই প্রধান কথা, পরিশ্রম বা দেহ সঞ্চালন গৌণ কথা। যেখানে মনঃশক্তি দৈহিক শ্রমের সাথে সাথে পা ফেলিয়া চলিয়াছে, সেখানেই শ্রমজাত শ্রান্তি

অপেক্ষা শক্তি বেশী হইয়াছে। যেখানে মানুষের মন বন-জঙ্গলে ঘুরিয়াছে, আর দেহ গাধার বোঝা বহিয়াছে, সেখানে পরিশ্রমই সার হইয়াছে, দেহের মাংসপেশীও উপযুক্ত-রূপ পরিপুষ্ট হয় নাই, দেহের তন্তুগুলিও যথাযথরূপে দৃঢ় বা সহিষ্ণু হইতে পারে বলই। শরীরের কোনও বলই নাই, চিত্তের বলই বল, চিত্তের বলই প্রতিফলিত হইয়া দেহকে শক্তিশালী করিয়া তোলে। সুতরাং যাহাতে মন মহাশক্তির ধ্যান করে না, যে শ্রমে শরীরের প্রতি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের উপরে মনের প্রভাব ক্রীড়া করে না, তাহা অঙ্গ-সঞ্চালন নামে অভিহিত হইতে পারে, কিন্তু ব্যায়াম নহে। অঙ্গ-সঞ্চালনে দেহে রক্তের গতি নিরপেক্ষ-ভাবেই বর্দ্ধিত হয় বলিয়া স্বাস্থ্যকে অক্ষুণ্ণ রাখে এবং সাধারণ ভাবে শক্তিমত্তা বৃদ্ধি করে, কিন্তু দেহের রাজা যে মন, তাহার বিরাট কোষাগারের অমূল্য শক্তি-সম্পদ্-সমূহের কোনটাকেই লাভ করিতে পারে না। মনের সেই সকল সম্পদ্‌রাশি যদি দেহ-মধ্যে লাভ করিতে হয়, তাহা হইলে এই দেহকে মনের তত্ত্বাবধানে রাখিতে হইবে। মনের অভিভাবকত্বে থাকিয়া দেহ যখন উপযুক্ত হইবে, তখনই তার সকল সমৃদ্ধির উত্তরাধিকার দেহের পক্ষে সম্ভব এবং স্বাভাবিক হইবে।

আজিকার দিনে এই দুর্ভাগ্য দুর্গত অধঃপতিত দেশে মানুষের শক্তি তমিস্রার কোলে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। দানবের দানবী শক্তি নিজেকে অদ্বিতীয় জানিয়া ঘরে ঘরে পৈশাচিকী লীলা আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। তোমার কষ্টার্জ্জিত অন্ন

বলদর্পিত দস্যু কাড়িয়া নিতেছে, তোমার মনে শক্তি নাই, প্রতিবাদটুকু করিতে পারিতেছ না, দেহে বল নাই, প্রতিবিধান করিতে সমর্থ হইতেছ না। যে-দেহ মনের শক্তিকে বিকশিত করিবার অনুকূল ভাবে গঠিত হইতে স্বীকার করে নাই, সেই অক্ষম পঙ্গু-দেহ-মধ্যে মহাশক্তিশালী মনও কারারুদ্ধ নিস্তেজ পশুরাজের প্রায় মরার মতই বাঁচিয়া থাকে। তাই, আজ গৃহে গৃহে পরদার-লোলুপের লাম্পট্য অট্টহাস্যে তাণ্ডব নর্ত্তন করিতেছে। কিন্তু হায় দুর্ভাগ্য! সতীর সতীত্ব রক্ষা করিবার জন্য কেহ আমরা নশ্বর জীবনটাকে বলি দিতে পারিতেছি না। দেহ আমাদের মরিয়া গিয়াছে, তাই, অবিনশ্বর আত্মাকেও আমরা মরণশীল বলিয়া স্থির করিয়া লইয়াছি এবং প্রতিনিয়ত মরিয়াও মরার মত মরিতে একবারটী পারিতেছি না! আমাদের সুপবিত্র উপাসনা-মন্দির পাষণ্ডের পদভারে নিপীড়িত হইয়া ধূলিসাৎ হইতে চলিয়াছে, আমরা একবার সংহতিবদ্ধ হইয়া তাহার বিরুদ্ধে দুর্ব্বার প্রতিক্রিয়া-স্বরূপ দাঁড়াইতেছি না। এই পৌরুষ-বিলোপ, এই ক্লীবতা, জড়তা, এই জীবন্মৃত্যু ঘুচাইবার জন্য আজ ত' আমাদের দেহে-মনে অমিত শক্তি চাই ভাই! আজ শুধু অঙ্গ-সঞ্চালন করিয়া স্বাভাবিক স্বাস্থ্য বজায় রাখিতে পারিলেই যথেষ্ট মনে করিব না। আজ চাই তোমাদের বাহুতে এমন শক্তি, যাহা অত্যাচারীর হৃৎকম্প উপস্থিত করিবে, যাহা বিনা-বাক্য-

ব্যয়ে অন্যায়ের উচ্ছেদ করিবে। যে বাহুর সমক্ষে আগ্নেয়গিরির ধূম্রোদগার থামিয়া যায়, সমুদ্রের তরঙ্গ থম্‌কিয়া দাঁড়ায়, তেমন সক্ষম সবল বাহু তোমাদের চাই। যে বাহু ইঙ্গিতে প্রলয় ঘটায়, নিমেষে ঝঞ্ঝা বহায়, ইসারায় ভূমিকম্প আনে, তোমাদের আজ তেমন বাহুবল দেখিতে চাই। যে বাহুবল থাকিলে মানুষ কোনও প্রতিপক্ষকে গ্রাহ্য করে না,—কোনও বাধার মর্য্যাদা রাখে না, মৃত্যুচিন্তাকে মনের কোণেও ঠাঁই দেয় না, সেই বাহুবল তোমাদের মাঝে দেখিতে চাই। এই বাহুবল পর-পীড়নের জন্য নয়, আত্মরক্ষার জন্য, একমাত্র মনুষ্যত্বকে অপমান অসম্মান হইতে বাঁচাইবার জন্য, নারীত্বকে, সতীত্বকে, অসম্ভ্রম অমর্য্যাদার বিরুদ্ধে বর্ম্মাবৃত করিবার জন্য। দুঃস্থ মানব জাতির সকল দুঃখ এই বাহুবল অপসারিত করিবে, তাই আজ ইহাকে চাই। যে স্বাস্থ্য আত্মতোষণের অতিরিক্ত আর কিছুই চাহিল না, সহজ আরামের অতিরিক্ত আর কাহাকেও ভালবাসিল না, সেই সুঠাম, সুন্দর, নিটোল স্বাস্থ্য চাহি না।

ব্যায়াম-কালীন ধ্যান-পরতা

তাই, আজ তোমাদিগকে অঙ্গ-সঞ্চালনের কথা ভুলিয়া ব্যায়ামের কথা মনে রাখিতে হইবে। ব্যায়াম করিবার সময়ে প্রতি শিরা-উপশিরার স্পন্দনের সাথে সাথে মনকে সেই স্থানে ধ্যানগতিতে চালনা করিবে। আর দৃঢ়চিত্তে সঙ্গে সঙ্গে সঙ্কল্প করিবে,—"জগতের সুমহৎ কল্যাণের জন্য, বিশ্বমানবের দুঃখ-

মুক্তির জন্য, সকল দুঃখ কষ্ট-নির্য্যাতন নির্ব্বাক্ চিত্তে সহিবার জন্য আমি আমার প্রতি অঙ্গ-গতিতে এমন অপূর্ব্ব শক্তির সঞ্চার পাইতেছি, যাহা বিশ্বজগতের শক্তি-সাধনার ইতিহাসে অতুলনীয়, অপরাজেয়।" দন্তে দন্ত চাপিয়া, শ্বাস-প্রশ্বাস নিয়মিত করিয়া, মনকে সংযত রাখিয়া, প্রতিজ্ঞা করিবে,—"আমার এই শক্তি পরের পীড়ন করিবে না, স্বার্থের সন্ধান করিবে না, সহিষ্ণুতা হারাইবে না।" আরও প্রতিজ্ঞা করিবে,—"আমার এই শক্তি সতীত্বের অবমাননা সহিবে না, দুর্ব্বলের উপর সবলের অত্যাচার সহিবে না, ধর্ম্মাচরণের স্বাধীনতায় অনধিকার-চর্চ্চার উদ্ধত অশিষ্টতা সহিবে না।" সর্ব্বশেষে দৃঢ়রূপে বিশ্বাস করিবে,—"আমার এই শক্তি বিশ্বস্রষ্টারই মহাশক্তি, আমার এই বীর্য্য অবিমিশ্র ব্রহ্মবীর্য্য। যাঁহার শাসন কেহই লঙ্ঘন করিতে পারে না, যাঁহার প্রতিষ্ঠা কেহই স্খলিত করিতে পারে না, সেই অদ্বিতীয় পরমেশ্বরের অপরিমেয় ঐশ্বর্য্য আমি শক্তি ও মনোবল-রূপে লাভ করিতেছি। নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাসে আমি তাঁহারই মহাশক্তির অমৃত আকণ্ঠ পান করিয়া অপাপবিদ্ধ অপরাজেয় হইতেছি। আমার সকল শক্তি ভগবানের, আমার সকল সামর্থ্য ভগবানের, আমার সকল পৌরুষ ভগবানের, আমার সকল সংগ্রাম-জয় ভগবানের। ভগবানেরই কাজে ভগবানেরই তেজোবীর্য্য আমাকে তেজস্বী ও বীর্য্যবান্ করিতেছে, সেই ভগবানের কাছে আমি সম্পূর্ণরূপে আত্ম-সমর্পণ করিলাম।"

অষ্টম পরিচ্ছেদ

ব্যায়ামের উপযোগিতা

ব্রহ্মচর্য্য-রক্ষার্থীর পক্ষে দৈহিক ব্যায়াম একান্তই প্রয়োজন। ইহাতে দেহের দৃঢ়তা ও বলবত্তা বর্দ্ধিত হয়, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সুঠাম সুগঠিত হয়, কান্তিপুষ্টি উপচিত, আলস্য অপনীত এবং অগ্নি প্রদীপিত হয়। ব্যায়ামে দেহ লঘু, সচ্ছন্দ-গতি ও জড়তা-বর্জ্জিত হয়। সার্ব্বাঙ্গিক ব্যায়ামের ফলে বায়ু, পিত্ত, কফ সাম্যাবস্থায় অবস্থান করিয়া মনকে প্রশান্ত, প্রফুল্ল ও প্রয়াসপটু এবং মস্তিষ্ককে স্নিগ্ধ ও গুরুতর-কষ্টসাধ্য শ্রমেও অকাতর রাখে। ইহা হইতে তেজস্বিতা, অকুতোভয়, উৎসাহ, অধ্যবসায়, কৃচ্ছ্র-সহিষ্ণুতা, ধর্ম্মিষ্ঠতা, একনিষ্ঠা, আত্মনির্ভরতা, আত্মশ্রদ্ধা ও আত্মোৎসর্গের আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হয়। মোট কথা, ব্যায়াম হইতে মানবোচিত যাবতীয় গুণাবলী সঞ্জাত হইয়া থাকে। বিশেষ কথা এই যে, ইঁহাতে কামদমনের ক্ষমতা অত্যন্ত বর্দ্ধিত হয় এবং দেহমনের উত্তেজকতার উপরে ব্যায়ামাভ্যাসীর অসাধারণ কর্ত্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। ব্যায়াম-কালে বিক্ষিপ্ত মনকে নিজের দেহমধ্যে নির্দ্দিষ্ট পেশীসমূহে নিবিষ্ট করিতে হয় বলিয়া ইহাতে প্রতিদিনই মনের অভিনিবেশের ক্ষমতা বাড়ে; সুতরাং সদ্বিষয়ে মনকে অধিককাল নিযুক্ত রাখা বা অসদ্বিষয় হইতে মনকে আকর্ষণ করিয়া আনার সামর্থ্য সহজেই ব্যায়ামশীলের মধ্যে সঞ্চিত হয়।

ব্যায়াম ও মস্তিষ্কের শক্তি

অনেকে বলিয়া থাকেন, ব্যায়াম করিলে মস্তিষ্কের শক্তি কমিয়া যায়, মেধা হ্রাস পায়। বলা বাহুল্য, সকল ব্যায়ামেই মস্তিষ্কের সামর্থ্য নাশ করে* এমন কথা অজ্ঞলোকের স্বকপোল-কল্পিত বহু-ভাষ মাত্র। ব্যায়ামে ভুক্তদ্রব্যসমূহ সম্পূর্ণরূপে পরিপাক পায় বলিয়া, দেহে রস-রক্তাদি সপ্তধাতুর প্রাচুর্য্য জন্মে, উহাদের সারাংশ-স্বরূপ যে বীর্য্য, তাহাই দেহের স্থিতির মূল কারণ এবং সকল মেধা-মনীষার উহাই একমাত্র উৎসস্বরূপ। ব্যায়ামে বীর্য্য বর্দ্ধিতই হয়, সুতরাং প্রকৃত প্রস্তাবে ইহাতে মেধাও বর্দ্ধিতই হয়, হ্রাসপ্রাপ্ত হয় না। আমাদের দেশের স্কুল-কলেজের ভাল ছেলেরা স্মৃতিশক্তি কমিবার ভয়ে ব্যায়াম করে না, অথচ নিশ্চিত ধ্বংস জানিয়াও মৈথুন, কুচিন্তা, কদালাপ ছাড়িয়াছে কৈ? তর্কস্থলে যদি স্বীকার করি যে, ব্যায়ামে প্রতিভা-বিকাশে বাধা জন্মে, তথাপি ইহা একেবারে চির-নির্দ্ধারিত কথা যে, কুচিন্তায়, কু-কথায়, কু-দর্শনে, কু-স্পর্শনে, কু-করণে বীর্য্যক্ষয় হইলে, তাহাতে স্মৃতিশক্তি বা ধারণা-শক্তির যে প্রচণ্ড ক্ষতি হয়, ব্যায়ামে কিছুতেই তাহার দশসহস্রাংশও হইতে পারে না। আমাদের দেশে বুদ্ধিজীবী ব্যক্তিগণের মধ্যে

---

* কুস্তি প্রভৃতির অঙ্গীভূত কোনও কোনও ব্যায়াম-প্রক্রিয়া ঘাড়ের উপর অত্যন্ত আঘাত করে। সেই সকল ব্যায়াম ব্রহ্মচারীর পক্ষে অবশ্য-পরিত্যাজ্য।

ব্যায়ামপরায়ণের সংখ্যা খুব বিরল, সুতরাং ব্যায়ামে বুদ্ধিবৃত্তির হ্রাস হয় কি না, তাহা দেশী দৃষ্টান্তে প্রমাণিত হইবে না। কিন্তু পাশ্চাত্য জগতের দিকে একবার তাকাইয়া দেখ, জ্ঞানে-বিজ্ঞানে বুদ্ধি-চাতুর্য্যে যাঁহারা শ্রেষ্ঠ-বরিষ্ঠ, তাঁহাদের অধিকাংশই এমন কি আমরণ ব্যায়ামাভ্যাসী। দৈহিক শক্তি লাভের নেশা পাশ্চাত্য দেশীয় অধিকাংশ ব্যক্তির স্কন্ধে ভূতের মত চাপিয়া থাকে বলিয়াই তাঁহারা শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রনীতিজ্ঞ, অধ্যাপক, বিচারক, কবি, বক্তা, ঐতিহাসিক, রাসায়নিক বা লেখক হইয়াও, সমগ্র জীবন ভরিয়া বিশ্রামহীন পরিশ্রম করিয়াও ভারতীয় উকিল, মুন্সেফ, ডেপুটীর ন্যায় কোনক্রমে যৌবন ছাড়াইয়া প্রৌঢ়ত্বে পদার্পণ করিতে না করিতেই বহু জটিল ব্যাধিতে পীড়িত হইয়া জীবনের সকল সৌভাগ্যের দরবার হইতে পেন্সন লইয়া বসেন না। পাশ্চাত্যের সম্ভোগ-পরায়ণ সভ্যতার বিষাক্ত স্তন্য পান করিয়াও যে আজিকার দিনে কাব্য, সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতি যাবতীয় বিষয়ে পাশ্চাত্য জগৎ বর্ত্তমান ভারতকে অনেক পিছনে ফেলিয়া রাখিতে পারিয়াছে এবং আরও অনেক কাল যে অবিসংবাদিত-রূপে পারিবে, তাহা হইতেই প্রমাণিত হয় যে, ব্যায়ামাভ্যাস জাতীয় সৌভাগ্যেরই সূচনা করে, বুদ্ধিবৃত্তির বন্ধ্যাত্ব আনিয়া জাতিকে দুর্ভাগা করে না। আর প্রকৃতই যদি বুদ্ধি-শুদ্ধির দৌড় একটু কমাইয়া দিয়া ব্যায়াম আমাদিগকে পাশ্চাত্যদের মত আত্মনির্ভর আত্মশ্রদ্ধ ও

স্বাধীনতালিপ্সু করিয়া তুলিতে পারে, তাহা হইলে বুদ্ধি একটু কমিলে আমার আদৌ আপত্তি নাই।

প্রকৃত প্রস্তাবে অতিবুদ্ধির ফলেই কিন্তু আমাদের গলায় দড়ি পড়িয়াছে। বুদ্ধির গরজে আমরা মনুষ্যত্বের দাড়ী টানিয়া উপ্‌ড়াইয়া ফেলিয়াছি, এবং অপ্রার্থিতভাবে নিজেদিগকে অপরের সম্ভোগবস্তু করিয়া রাখিয়াছি। বুদ্ধি কমিয়া বোকামি একটু বাড়িলে আমরা সংহতি ভাঙ্গিতাম না, সৎসঙ্গ হারাইতাম না, অঙ্গহীন হইতাম না। বোকার দলে নিজেদের মধ্যে খোঁচাখুচি নাই, ধারালো শক্ত শক্ত কথা থাকিলেও পেঁচালো আচরণ নাই, শক্তির সংঘর্ষ থাকিলেও ধার-করা পরের সহায়তা নাই। বোকারা ছোরা চালাইতে জানে, কিন্তু ছোরার মুখে মধু মাখিতে জানে না; সম্মুখে দু' ঘা' বসাইতে পারে, অন্ধকারে গুপ্ত বাণ ছাড়িতে পারে না। ব্যায়াম যদি এমন উলঙ্গ সরল করিয়া আমাদিগকে বুদ্ধির গরল হইতে রক্ষা করে, তবে ত' ব্যায়াম আমাদের অপরিহার্য্য-রূপেই প্রয়োজন।

ব্যায়াম ও ক্রীড়া

অনেকে আবার একথাও বলেন যে, ব্যায়াম না করিয়া ক্রীড়া করিলেই ত' চলে। কিন্তু ক্রীড়া এবং ব্যায়ামে প্রচুর পার্থক্য রহিয়াছে। ক্রীড়ার সময়ে তোমার মন তোমার দেহের মধ্যে থাকে না, থাকে ক্রীড়ার মধ্যে। ফুটবল-খেলোয়াড় দেহের গঠনের ধ্যান করে না, করে একমাত্র বলটীর। তাহার মন

তাহার দেহ-মধ্যে সঞ্চালিত হয় না, পাদতাড়িত বলটী যখন যেখানে যায়, তার মন তখন সেখানে থাকে। তাই, মনের মধ্যে সংযম-শক্তি জাগ্রত হইতে পারে না। খেলা আনন্দদায়ক, এই বলিয়াই জীবনের ব্রতসাধনে খেলাকে বড় করিতে পারি না! নিজ ব্রতের প্রতি যাহার অবিচলিত নিষ্ঠা, তাহার পক্ষে ব্যায়ামও আনন্দদায়ক। জোর করিয়া ইচ্ছার বিরুদ্ধে লেখাপড়া করাইয়া আমরা আমাদের দেশের ছাত্রদের অধ্যয়ন হইতে আনন্দকে নির্ব্বাসিত করিয়াছি। কিন্তু জ্ঞানলাভের প্রবল আকাঙ্ক্ষা দ্বারা প্রেরিত হইয়া স্বাধীনভাবে যাঁহারা অধ্যয়নাদি করিয়াছেন, তাঁহাদের মুখমণ্ডল যে আনন্দের আলোকে জ্যোতির্ম্ময় হইয়া রহিয়াছে! মানুষের প্রাণের টান যেখানে গিয়া পড়িয়াছে, মানুষের মনের আনন্দ সেইখানেই বনচারী স্বচ্ছন্দগতি মুক্ত-বিহঙ্গমের ন্যায় অবাধ উদ্দাম হইয়াছে। ব্যায়ামকে স্কুলের ড্রিলের মত বাধ্যকর করিতে গেলে কোনও কাজ হইবে না। এমন এক অপূর্ব্ব জীবনের ছবি সকলের চক্ষের সম্মুখে উপস্থাপিত করিতে হইবে, এমন এক পৌরুষপূর্ণ পরিশুদ্ধ আদর্শ সকলের হৃদয়-ফলকে গাঁথিয়া দিতে হইবে, যাহাতে ব্যায়ামকে সকলে খেলার চেয়ে ঢের বেশী ভালবাসিতে পারে। ব্যায়াম আমাকে মানুষের সমাজে সমান মাথায় দাঁড়াইতে দিবে, এই কথাটাই প্রাণে জাগরূক রাখা দরকার। সর্ব্বজনীন-ভাবে এই কথা তোমরাই প্রাণে প্রাণে জাগাইবে,

আমার একার চেষ্টায় কুলাইবে না। কিন্তু, সকলের মাঝে জগৎ-কল্যাণ কামনায় যাহা জাগাইতে চাহ, তাহা তোমার নিজের মনের মাঝেও জাগাইতে হইবে। নিজে ঘুমাইয়া অপরকে জাগান যায় না, নিজে বদ্ধ রহিয়া অপরের বন্ধন খোলা চলে না।

ব্যায়ামের পরিমাণ

বয়স, বল, দেশ, কাল ও আহার এই সকল বিবেচনা পূর্ব্বক বলের অর্দ্ধ পরিমাণ মাত্রায় অর্থাৎ ব্যায়াম করিতে করিতে যখন দেখিবে মুখ দিয়া শ্বাস বাহির হইতেছে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত ব্যায়াম করিবে। ব্যায়ামের পরে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ মর্দ্দন বিশেষ হিতকারী। ইহাতে ব্যায়ামের সুফল অতি সহজে পরিদৃষ্ট হয় এবং সেই ফল স্থায়ীও হয়। মেদোনাশ এবং ত্বকের নির্ম্মলতা ত' হয়ই।

ব্যায়ামে বিশ্রাম

ব্যায়াম-কালে দেহ-নির্গত ঘর্ম্ম মুছিতে হইবে না, গায়ে শুকাইবে। ব্যায়ামের পরে উপযুক্ত-রূপ বিশ্রাম করা প্রয়োজন। বসিয়া বসিয়া কখনও বিশ্রাম করিবে না। ধীরে ধীরে অঙ্গান্দোলিত করিয়া পদচারণা পূর্ব্বক বিশ্রাম করিবে। পরিশ্রমের পর সহসা বিশ্রাম লইলে তাহাতে দ্রুত প্রবাহিত রক্ত বাধা প্রাপ্ত হইয়া বায়ু প্রকোপিত করে এবং তজ্জনিত বহুবিধ ব্যাধি জন্মায়। ব্যায়ামের পরে অভ্যাসানুসারে

প্রাতঃস্নান করিবে। যাহারা প্রাতঃস্নান করে না, তাহাদের পক্ষে সর্ব্বাঙ্গ সিক্ত বস্ত্র-খণ্ড দ্বারা পরিমার্জ্জিত করিয়া মল-মুক্ত করা কর্ত্তব্য।

স্নান ও তৈলাভ্যঙ্গ

ব্রহ্মচারীর পক্ষে তিন বেলা স্নান বিশেষ হিতকারী। কিন্তু ইহাও সকলের পক্ষে নির্ব্বিচারিত চিত্তে গ্রহণীয় নহে। পিত্ত-বা বায়ুপ্রধান ধাতে ইহা সহিবে, কিন্তু কফ-প্রধান ধাতে অথবা বীর্য্যক্ষয়াদি-জনিত অতিরিক্ত দুর্ব্বল দেহে ইহা প্রথমে সহিবে না। সুতরাং নিজ নিজ শারীরিক অবস্থা বুঝিয়া তিনবেলা স্নানের ব্যবস্থা করা উচিত। অনেক স্থানে পানযোগ্য দূরের কথা, স্নানযোগ্য সুপরিষ্কৃত জল পাওয়াই দুরূহ ব্যাপার। সেই সব স্থলে স্বাস্থ্যপ্রার্থীরা দূরবর্ত্তী জলাশয় সমূহে গিয়া স্নানাবগাহন করেন। তাঁহাদের পক্ষে তিনবেলা স্নান উপকারী নহে। কারণ, স্নানের দ্বারা দেহে যে স্নিগ্ধতা সঞ্চারিত হয়, পথপর্য্যটন দ্বারা তাহার বিরুদ্ধ ক্রিয়া হয়। বর্ষাকালেও তিনবেলা স্নান অনেক ক্ষেত্রে অপকারী। তিনবেলা স্নান প্রথম আরম্ভ করিবার পক্ষে অগ্রহায়ণ মাসেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট সময়।

স্নানের পূর্ব্বে সর্ব্বাঙ্গে তৈলাভ্যঙ্গ অকর্ত্তব্য বলিয়া কথিত হইয়াছে। প্রাচীনকালে তৈলাদি লেপন বিলাসিতা বলিয়া পরিগণিত হইত এবং স্বভাবতঃ সকলেই দৃঢ়দেহ ছিলেন

বলিয়া তাঁহাদের সন্তান-সন্ততিগণের পক্ষে ব্রহ্মচর্য্যাভ্যাস-কালে তৈলাভ্যঙ্গ নিষ্প্রয়োজন ছিল। সেই জন্য উহা নিষিদ্ধ হইয়াছিল। আজি-কালকার যুগে দেশাচার প্রভৃতির বহুল পরিবর্ত্তন হওয়ায়, যাহা যাহা পূর্ব্বে অনাবশ্যক ছিল, তাহার অনেক কিছুই বর্ত্তমান সময়ে আবশ্যকীয় হইয়াছে। বিবিধ প্রকারের সামাজিক এবং ঐতিহাসিক উপপ্লবে সমাজ-গঠনের ধারা প্রাচীন যুগ হইতে পৃথক্ হইয়া পড়িয়াছে। আজ আর প্রাচীন যুগকে ষোল আনা অনুকরণ করিবার উপায় নাই, অনেক স্থলে তাহা যুক্তিসঙ্গতও নহে। অনেকস্থলে প্রাচীনকে জোরজবরদস্তি করিয়া নকল করিয়া শক্তির অপব্যবহারও যে করা হইবে না, তাহা নয়। সমগ্র জগতের যেখানে যে যুগে যে সৌন্দর্য্যটুকু ফুটিয়াছে, তাহাই চয়ন করিয়া আনিয়া ভারতের উদ্যানে এক অপরূপ যুগ-সম্মেলন এবং সভ্যতা-সমন্বয় সাধিতে হইবে। এইজন্যই, প্রাচীনের প্রতি সম্পূর্ণ শ্রদ্ধা রাখিতে হইলেও প্রাচীনের প্রতি স্বজন-সুলভ-মোহ পরিত্যাগ করিতে হইবে। প্রসঙ্গক্রমে এইটুকু ইঙ্গিত মাত্র করিয়া রাখিলাম। বর্ত্তমান সময়ে দেশের লোকের স্বাভাবিক স্বাস্থ্যই এত দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে যে, তৈলাভ্যঙ্গের মত এমন হিতকারী একটা ব্যাপারকে বিলাসিতা বলিয়া উড়াইয়া দিতে পারি না। মস্তকে তৈলাভ্যঙ্গ করিলে শিরোরোগ নাশ হয়, চক্ষুর দীপ্তি বর্দ্ধিত হয়, কফ ও বায়ুর প্রকোপজনিত রোগ আরোগ্য হয়। ইহাতে

কেশরাজি কোমল, কুঞ্চিত, সুদীর্ঘ, ঘন, স্নিগ্ধ ও বহুপরিমাণে উৎপাদিত হয় এবং খালিত্য ও ইন্দ্রলুপ্ত (টাকপড়া) নিবারিত হয়। ইহাতে মস্তিষ্ক শীতল, স্নিগ্ধ এবং পরিপুষ্ট হয়। সর্ব্বশরীরে অভ্যঙ্গ করিলে দেহ কোমল, শীতোষ্ণাদি-সহিষ্ণু, শ্রমে অকাতর, সহসা পতনে বা আঘাতে অক্ষুণ্ণ হয় এবং শ্লেষ্মা ও বায়ুর সমতা সাধন করিয়া ইহা ধাতু-সমূহকে পুষ্ট, স্রোতঃসমূহকে বিশুদ্ধ গাত্র-চর্ম্মকে চিক্কণ বল-বর্ণ বৰ্দ্ধিত করে। পদতলে অভ্যঙ্গ করিলে সুনিদ্রা হয়, চক্ষুর জ্যোতিঃ বাড়ে, শ্রান্তি ও জড়তার নাশ হয় এবং পথপর্য্যটনশক্তি অটুট থাকে। কর্ণে তৈল প্রয়োগ করিলে হনু, মস্তক ও কর্ণবেদনা নিবারিত হয়। এইরূপ মহোপকারী যে তৈলাভ্যঙ্গ, তাহা শুধু প্রাচীন-কালের দোহাই শুনিয়া বর্জ্জন করিতে পারি না। "তেলে জলে বাঙ্গালীর শরীর"।

তবে এক কথা, প্রাতে ব্যায়ামাভ্যাসীর পক্ষে অভ্যঙ্গ করিয়া প্রাতঃস্নান ঠিক হইবে না। কারণ, ব্যায়ামের পরে ঘর্ম্মসিক্ত দেহে অথবা শুষ্ক-ঘর্ম্ম-লিপ্ত দেহে তৈলাভ্যঙ্গ করিলে, তাহার উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হইয়া যাইবে। অতএব প্রাতঃস্নানাভ্যাসী বিনা তৈলে অথবা একমাত্র মস্তকে সামান্য তৈল লিপ্ত করিয়া স্নান করিবে এবং মধ্যাহ্ন স্নানের পূর্ব্বে অৰ্দ্ধ ঘণ্টা হইতে এক ঘণ্টা কাল পর্য্যন্ত বিশেষ যত্নের সহিত অভ্যঙ্গ করিবে। তৈল মর্দ্দন করিবার কালে,—"দেহ সুস্থ, সবল, কান্তি-পুষ্টি-বিশিষ্ট

এবং উজ্জ্বল হইতেছে, দেহস্থ যাবতীয় রোগ ও দুর্ব্বলতা দূর হইতেছে, দেহ স্বচ্ছন্দ, সুন্দর ও সুঠাম হইতেছে"—এইরূপ চিন্তা করিতে হইবে। যাহারা ত্রিসন্ধ্যা-স্নানাভ্যাসী নহে, তাহাদের পক্ষে মধ্যাহ্ন-স্নান বেলা নয়টার পূর্ব্বেই সমাপ্ত হওয়া প্রয়োজন।

ব্যায়ামের পরে অঙ্গমর্দ্দনের যে সকল নিয়ম আছে, অভ্যঙ্গের সময়েও সেইরূপেই অঙ্গমর্দ্দন হিতকর। যেমন দক্ষিণ হস্ত মর্দ্দন কালে মাসংপেশীকে বাঁ হইতে ডানদিকে চাপিতে হয়, আবার দক্ষিণ বাহু মর্দ্দনকালে পেশীকে ডান হইতে বামদিকে চাপিতে হয়। বাম হস্ত ও বাম বাহু মর্দ্দনকালে ঠিক্ ইহার বিপরীত করিতে হয়। বক্ষোমর্দ্দন-কালে বক্ষোমাংস উপর দিক হইতে নিম্নদিকে না ঠেলিয়া নিম্নদিক হইতে উৰ্দ্ধদিকে ঠেলিতে হয়।

অভ্যঙ্গের পরে স্নান করিবে। স্নান করিলে উত্তেজিত দেহের স্নায়ুমণ্ডলী স্নিগ্ধ হয়, আলস্যাচ্ছন্ন দেহের জড়তা অপনোদিত হয়, রোমকূপের সঞ্চিত ঘর্ম্মাদি-জাত মলসমূহ বিদূরিত হয়, ইন্দ্রিয়-সমূহ প্রসন্ন হয়, শোণিত শোধিত হয়, জঠরাগ্নি উদ্দীপিত হয়, তন্দ্রা বিনষ্ট হয় এবং শ্রান্তি দূর হয়। স্নানকালে সর্ব্বপ্রথমে মস্তকে জল দিবে, তারপরে জলে অবতরণ করিবে। নতুবা দেহস্থ রক্ত মস্তিষ্কে ধাবিত হইয়া শিরোরোগ জন্মাইতে পারে। স্নানকালে গাত্র-মার্জ্জনী দ্বারা

সর্ব্বাঙ্গ উত্তমরূপে পরিমার্জ্জিত করিবে। ডুব দিয়া স্নান না করিয়া ঘটি দ্বারা জল তুলিয়া মাথায় দিলে বেশী উপকার পাইবে। আর যদি, নিজ অঞ্জলি মধ্যে জল লইয়া ঊর্দ্ধ-ললাটে নিক্ষেপ করিয়া করযুগদ্বারা উহা সমগ্র মস্তকে সঞ্চারিত করিয়া দিতে পার, তাহা হইলে উহাই সর্ব্বোত্তম হইবে।

স্নানান্তে উপাসনা

স্নানান্তে শুষ্ক শুভ্র বস্ত্র পরিধান করিবে। পদধাবন করিয়া পাদুকা গ্রহণ করিবে এবং শুদ্ধ চিত্তে শান্ত মনে উপাসনায় আত্মনিয়োগ করিবে। উপাসনা করিতে কালাকাল নাই,—

"তাঁরে ডাক্‌তে আবার দিন কি রাতি
ভোর কি দুপুর লাগবে কিসে?"
(সতীশচন্দ্র)

বারাবারও নাই,—যতবার খুসী উপাসনা করিতে পার। কিন্তু তবুও প্রবর্ত্তক সাধকদের পক্ষে নির্দ্দিষ্ট সময়ে নির্দ্দিষ্টবার উপাসনা প্রয়োজন। নতুবা নিষ্ঠা ও নির্ভরে এবং মনঃসংযমের সাফল্যে বহু বিঘ্ন জন্মে। তোমরা বর্ত্তমানে দিনের মধ্যে চারিবার উপাসনা করিও। যথা,—প্রত্যূষে, মধ্যাহ্ন-স্নানের পর, সান্ধ্য-স্নানের পর এবং শয়ন-কালে। মহাজনের উপদেশ পাইলে তদনুযায়ী উপাসনা করিতে হয়, নতুবা নিজ চিত্তের উলঙ্গ মূর্ত্তি ভগবানের কাছে নিঃসঙ্কোচে ধরিয়া অকল্যাণের ধ্বংস ও কল্যাণের উদ্বোধন প্রার্থনা করিতে হয়।

সংস্কৃত, হিব্রু বা আরবী ভাষায় ভগবানকে না ডাকিলে তিনি শুনিবেন না, ইহা মিথ্যা কথা। যে ভাষায় ডাক না কেন, যেমন করিয়া আত্মনিবেদন কর না কেন, তিনি ত' সর্ব্বান্তর্য্যামী, তিনি ত' ভাবগ্রাহী, তিনি তোমার সরল একান্ত প্রার্থনায় কর্ণপাত নিশ্চয় করিবেন। উপাসনার ভাষায় কোন কবিত্ব রাখিবে না। অনেক সময়ে কবিত্বের সাথে মিথ্যা আসিয়া উকি-ঝুকি দেয়। যাহা সত্য, যাহা নির্ভুল, তাহাই ভগবানের কাছে অকপটে ব্যক্ত করিবে। ইহাই উপাসনার গোড়ার কথা।

উপাসনা অন্ধকারে
জ্বালায় আলোক
দূর করে অবিশ্বাস
দুঃখ মোহ শোক!
—স্বরূপানন্দ

নবম পরিচ্ছেদ

কি প্রার্থনা করিব ?

কি প্রার্থনা করিবে ইহা নিশ্চয় এক জটিল প্রশ্ন। যিনি সর্ব্বনিয়ন্তা, সর্ব্বেশ্বর, তাঁহার কাছে কি চাহিব ? তিনি ত' অবদানকল্পতরু ; যাহা চাহিব, তাহাই পাইব, কিন্তু কি যে চাহিতে হইবে, তাহাই ত' ভাবিয়া পাইতেছি না।

আচ্ছা, টাকা চাহিলে হয় না ? বস্তায় বস্তায় টাকা আনিয়া জমা করিলে সুখ-শান্তি ত' হইবেই, প্রত্যুত পরোপকারও করা যাইবে প্রচুর। ভিক্ষার্থীকে ভিক্ষা, অতিথিকে অন্ন, আশ্রয়ার্থীকে আশ্রয় দেওয়া চলিবে। কেমন ?

ভুল বুঝিয়াছ। টাকায় ফাঁকা আওয়াজ করিয়াছে ; তাই মনে করিতেছ, ইহাই সুখ ইহাতেই শান্তি, ইহাতেই মানব-জীবনের সাধ-আকাঙ্ক্ষার পূর্ণপরিতৃপ্তি। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তাহা নহে। সোণার একটা খনিও যদি পাও, দেখিবে কামনার উপভোগ দ্বারা কামনার শান্তি হয় নাই। "চাই" "চাই" রব যদি না ঘুচিল, তবে কোথায় তোমার শান্তি, আর কোথায় তোমার সুখ ? অর্থের ঝনৎকারের সঙ্গে সঙ্গেই ঐ এক থলিতে করিয়াই অশান্তিও আসে। টাকা দিয়া সুখ কিনিতে তুমি যতই চাহিবে, ততই দেখিবে, উদ্বেগ ও অশান্তি গয়ার

ভূতের মত তোমার কাঁধে আরও জোর করিয়া চাপিয়া বসিতেছে ; যখন তার চাপ অসহ্য হইবে, তখন বাপ বলিয়া তুমি পালাইতে চাহিবে, কিন্তু কম্‌লী তোমাকে ছাড়িবে না। লোভে ও লালসায় চক্ষু অন্ধ না হইলে, এই কথাটুকু সহজেই ধরা পড়ে, দূরবীন কষিতে হয় না। আর যদিও বা অর্থ-লাভে সুখ হয়ই, তথাপি সে সুখ কি কখনও চিরস্থায়ী হয় ? ধন-সম্পদ বিদ্যুতেরই মত চঞ্চল, জল-বুদ্‌বুদেরই মত ক্ষণস্থায়ী, দীপশিখারই ন্যায় অস্থির এবং কাচখণ্ডেরই ন্যায় ভঙ্গুর। তারপরে আবার পরোপকার করিবে ত'! কথাটা শুনিতে খুবই সুমিষ্ট কিন্তু কাজের বেলায় গা-ঢাকা লালসার বেগার ঠেলা ছাড়া হাজার-করা নয় শত নিরানব্বই জনের জীবনে আর কিছু দেখা যায় না। তোমার সুদিনে দুর্দ্দৈন্য-পীড়িত আর্ত্ত আসিয়া দুঃখের কথায় তোমার কাণের পোকা বাহির করিতে পারিবে কিন্তু হাত দিয়া একটী সিকি পয়সা গলাইতে পারিবে না ; তোমার হয়ত চক্ষের জল আনিতে পারিবে কিন্তু তাহাদের চিড়া ভিজাইবার জল পাইবে না। বিলাসের মণ্ডপে তখন তুমি হয়ত যমের দোসর হইয়া বসিবে, ধরাকে সরা মনে করিয়া হুহুঙ্কারে মেদিনী কাঁপাইবে, কোথায় বা থাকিবে তখন দীন-পালনের ভীষ্ম-প্রতিজ্ঞা আর কোথায় বা থাকিবে তোমার পরোপকারের ধনুর্ভঙ্গপণ। আর যদিও বা ভাগ্যগুণে শুক্তির মুখে স্বাতীনক্ষত্রের জল-বিন্দু পড়ে, তাহা হইলেও

তোমার তাহাতে গৌরব করিবার কি আছে? পরের ধনে পোদ্দারী করিয়া পৌরুষ কি? কারণ, এই যে পার্থিব জগৎ ইহার সকল সমৃদ্ধিতে সকলের সমঅধিকার, তুমি অন্যকে বঞ্চিত করিয়া নিজের সিন্দুকে সঞ্চয় করিতে পারিয়াছ বলিয়াই যে উহা তোমার হইয়াছে, এই কথা কোন্ ন্যায়বান্ ব্যক্তি স্বীকার করিবেন? তোমার নিজস্ব যে ধন, তাহা পরের জন্য দিলে পৌরুষ স্বীকার করিতে পারি, তোমাকে মাথায় তুলিয়া নাচিতে পারি। সে ধন তোমার জীবন। উহা দিতে পারিলে, দানের মতই দান হইবে; আবার জীবন-দান সম্পূর্ণরূপে অর্থ-নিরপেক্ষ। সুতরাং অর্থ-প্রার্থনা সর্ব্বপ্রকারেই নিরর্থক।

রূপ, যৌবন, বল, বীর্য্যের প্রার্থনা যদি করিতে চাহ, তবে তাহাও তোমার ভ্রম। রূপ যৌবন প্রার্থনায় লাভ নাই, ইহা দ্বারা তোমার নিজের নিত্যকল্যাণ বা জগতের মঙ্গল হইবার সম্ভাবনা কম। বল-বীর্য্য জগৎ-কল্যাণে নিযুক্ত হইয়া সার্থক হয়, পরার্থে আত্মত্যাগ বল-বীর্য্য-সহায়ে অলঙ্কৃত হয় কিন্তু বলবীর্য্য লাভ তোমার পক্ষে ভগবন্নির্দ্দিষ্ট পথে এত সহজেই পৌরুষ-সিদ্ধ যে, উহার জন্য ভগবানকে প্রার্থনা না জানাইয়া ভক্তিনম্রচিত্তে তাঁহাকে স্মরণে রাখিয়া ব্যায়ামাদির অভ্যাস ও সর্ব্বপ্রযত্নে বীর্য্যরক্ষা করিলেই যথেষ্ট।

তবে কি প্রার্থনা করিবে? এই প্রার্থনা করিবে যে, "হে আমার সর্ব্বস্ব, আমার তন্দ্রাভিভূত আলস্যোপহত চিত্তকে

কঠোর লাঞ্ছনায় জাগাইয়া দাও, আমাকে আমার আত্মত্বে প্রতিষ্ঠিত হইতে দাও, আমাকে আত্মজয়ী এবং আত্মত্যাগী কর।

"আমাকে বুঝিতে দাও, তুমিই আমি, তোমার বিচিত্র বিকাশ-ক্ষেত্র এই জগৎ আমারও বিকাশেরই ভূমি। জগতের সকলে আমার আপনার জন, আমিও সকলেরই। আমাকে জানাইয়া দাও, তোমাকে ভালবাসিয়া আমি জগৎকে ভালবাসিয়াছি, জগৎকে ভালবাসিয়া তোমাতেই পরমাপ্রীতি স্থাপন করিতেছি। এমন করিয়া আমাকে প্রবুদ্ধ কর, যেন না ভুলি যে, অনন্তকোটি জীবগণের প্রতি অনাবিল মৈত্রী ও প্রীতির দুয়ার উন্মুক্ত না হইলে তোমাতে-আমাতে প্রেমের অবরোধ রহিয়া যাইবে।

"হে প্রার্থিত, আমি যখন স্বার্থে অন্ধ হইব, তখন তুমি বজ্র-রূপে আসিয়া আমার মস্তকে ঘোরনির্ঘোষে পতিত হইও,—আমাকে জানাইয়া দিও যে, আমি বিমনা হইয়া বিপথে ছুটিয়াছি। পরকে ঠকাইতে যাইয়া আমি নিজেই যে ঠকি, পরকে মারিতে গিয়া আমি নিজেই যে মরি, পদে পদে স্খলিত করিয়া হাত-পা ভাঙ্গিয়া দিয়া তুমি তাহাই আমাকে বুঝাইও। ফন্দী-চাতুরীর কুটিল পথ হইতে তুমি আমাকে প্রতিনিবৃত্ত করিও, আর, হৃদয়ের প্রতি স্পন্দনের সাথে সাথে বলিয়া দিও,—'এমন ঊষর ভূমি এজগতে কোথাও নাই, হৃদয়ের সরস পরশ যাহাকে হরষে না হাসায়, এমন কুৎসিত জিনিষ

এজগতে কোথাও নাই. প্রাণের অফুরন্ত প্রীতি যাহাকে সুন্দর না করে, এমন অপবিত্র কিছু এ জগতে কোথাও নাই, আত্মার পবিত্রতা যাহাকে পবিত্র না করে। ভণ্ডামি করিয়া পরতোষণের বৃত্তি হইতে তুমি আমাকে রক্ষা কর, অভিনয়ের অনুরাগ হইতে আমাকে ত্রাণ কর. অপবিত্রতার অস্পৃশ্যতা হইতে আমাকে দূরে রাখ। আমাকে বন্ধুসজ্জনের প্রতি প্রীতিশীল রাখ, অবান্ধবের প্রতি ততোধিক মমতাশীল কর।

"হে ভগবান্! যাবতীয় কর্ম্মের ভার আমার স্কন্ধে তুলিয়া দাও,—আমি যেন গুরুভার দেখিয়া বিন্দুমাত্র পরাঙ্মুখ না হই। আমি যেন মুখে মুক রহিয়া কর্ম্মে মুখর হই, বংশগত কৌলীন্য অগ্রাহ্য করিয়া তপস্যায় কুলীন হই, গিরিশৃঙ্গ দেখিয়া যেন থম্‌কিয়া না দাঁড়াই, পদভরে যেন তার স্পর্দ্ধিত শির অবনত করিতে পারি ; বাধা-বিঘ্নের বিশালতা দেখিয়া যেন আত্মনির্ভর না হারাই, তোমার পরমমঙ্গল শক্তি-গর্ভ নাম উচ্চারণ করিয়া যেন যথা তথা অবহেলে তোমার বিজয় নিশান প্রোথিত করিতে পারি। আমি যেন আমার গৌরবকে প্রতিষ্ঠিত করিতে না চাহি. কায়মনোবাক্যে যেন একমাত্র তোমারই অদ্বিতীয় মহিমার অনুসরণ করি। আমার বাধা আমার শক্তির স্ফুরণ করুক, আমার সাময়িক পরাজয় অন্তিমে সাফল্য অর্জ্জন করুক এবং আমার শক্তি ও সাফল্য তোমার মহিমায় বিলীন হউক।

"হে ভগবান্! আমার সকল বিশ্বাস ও অবিশ্বাস আমার

বুদ্ধি-বিচারের আশ্রয়ে না রাখিয়া প্রকৃত কর্ম্মের প্রত্যক্ষ আলোকে সত্য বা মিথ্যা বলিয়া প্রমাণিত কর। তোমার সতর্ক দৃষ্টির প্রহরায় রাখিয়া আমার বাহির এবং ভিতর সমভাবে বিকশিত কর, আমাকে সুন্দর কর, উজ্জ্বল কর, সার্থক কর কিন্তু আমি যেন মানুষকে শিক্ষা দিতে না যাই। আমার আচরণ সকলের প্রাণে স্বাধীন চিন্তার উন্মেষ দান করুক কিন্তু আমাকে বাক্যহীন একনিষ্ঠ রাখুক। পরকে যেন আমি দেশের কাজে, দশের কাজে আহ্বান না করি, সকলের ভিতরে আমার যতটুকু বিকাশ আমার তপস্যায় হইয়াছে, ততটুকুই যেন আত্মার বলে আকর্ষণ করি। আমার চিত্ত নেতৃত্বের ইচ্ছা পরিত্যাগ করুক, প্রভুত্বের লালসা পরিহার করুক। সকলের কাজে দোষ বাহির করিবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি চাহি না, অতুল ধন রাশি চাহি না, জগৎ-চালনী শক্তিও চাহি না. যদি শুধু মানুষ হইতে পারি। ওগো বিধাতা, ওগো জীবনের প্রভো, তুমি আমাকে মানুষ কর। এমন মানুষ কর, যে মানুষ কোনও অংশে দুর্ব্বল নয়, কর্ম্মের কোনও অংশে কাপুরুষ নয়, জীবনে মরণকে ভয় করে না, মরণে জীবনের জন্য অনুতপ্ত হয় না।

"হে বিভো! আনন্দের জ্যোতিঃরূপে তুমি আমার অক্ষিযুগে অধিষ্ঠিত হও। যাঁহার কথায় আনন্দ, যাঁহার দেখায় আনন্দ, যাঁহার স্মৃতিতে আনন্দ, কেবল তাঁহাকেই যেন দেখিতে পাই। অথবা সকলের মাঝেই যেন আমার সর্ব্বেন্দ্রিয় তাঁহারই রসাস্বাদন করে। হে পরমানন্দ, আমার সর্ব্বেশ্বর, আমার সম্পূর্ণ আমিত্বের মাঝে তুমি আবিষ্ট হও। হরিঃ ওঁ।"

দশম পরিচ্ছেদ

উপাসনার বিভিন্ন পদ্ধতি

আনন্দস্বরূপ ঈশ্বরে নিজ আত্মাকে নিমজ্জিত করিয়া পরমা পরিতৃপ্তি লাভ করিবার বহুবিধ উপায় আছে। ইহাদের যে-কোনও একটীকে অথবা অবস্থা-বিশেষে একাধিক উপায়কে অবলম্বন করিয়া শান্তি ও আনন্দ লাভের প্রয়াসকে উপাসনা বলে। নিজ নিজ ধর্ম্মানুগ সংস্কার, পিতৃপুরুষানুগ মস্তিষ্ক, পূর্ব্ব-জন্মানুগ সাধনা এবং পারিপার্শ্বিকানুগ রুচি-প্রকৃতির গঠনা-নুসারে অথবা দেশ-কালাদির বিভেদ-বৈষম্যানুযায়ী উপাসনা-পদ্ধতির পার্থক্য দেখা যায়। কেহ ঈশ্বরকে নামরূপাদিবর্জ্জিত, সংযোগ-বিয়োগ, জন্ম-মৃত্যু, সুখ-দুঃখাদি যাবতীয় পরস্পর বিরুদ্ধ গুণের অতীত উদাসীন জানিয়া উপাসনা করেন,—ইহারা নির্গুণোপাসক। কেহ তাঁহাকে সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান্, নিত্য-শুদ্ধ, শাশ্বত, চির কল্যাণময়, সর্ব্বাধার সর্ব্বনিয়ন্তা এবং সর্ব্বেশ্বর জানিয়া তাঁহার উপাসনা করেন,—ইঁহারা সগুণোপাসক। কেহ তাঁহাকে পূজ্য জানিয়া মানসোপচারে তাঁহার পূজা করেন, এইরূপ উপাসনাকে ভজনা বলে। কেহবা তাঁহার বিশেষ বিশেষ শক্তিকে কল্পনা-বলে মুর্ত্তিমতী করিয়া তদনুসারে প্রতিমা গড়িয়া প্রতিমাকে প্রতীক বা উপলক্ষ্য মাত্র জানিয়া নানাবিধ পার্থিব উপচারে তাঁহার বাহ্য-পূজা করিয়া থাকেন,—এইরূপ উপাসনাকে বলে অর্চ্চনা। কেহ কেহ ঈশ্বরের সর্ব্বব্যাপিত্ব, সর্ব্বসাধারণত্ব অনুধাবন করিতে না পারিয়া নিজ রুচি বা

পছন্দানুযায়ী যে-কোনও সীমাবদ্ধ সুন্দর বা ভীষণ, সচল বা অচল বিগ্রহ-মাত্রকেই সৃষ্টিকর্ত্তা ঈশ্বর ভাবিয়া পূজা করেন,—ইহাও অর্চ্চনা। কেহ-কেহ একমাত্র ভগবৎ-প্রেরিত হইয়াও যেন ফলাফল-লাভাকাঙ্ক্ষাহীন হইয়া ভগবদুপাসনা করেন,—ইহাকে বলে নিষ্কামোপাসনা। আবার কেহ কেহ "ধনং দেহি," "যশো দেহি," "দ্বিষো জহি" প্রভৃতি বলিয়া স্তব-স্তুতি দ্বারা দেবতার কৃপা বা করুণা ভিক্ষা করেন, ইহার নাম আরাধনা। এইগুলি সবই উপাসনার প্রকার-ভেদ।

যত মত, তত পথ

উপাসনার প্রত্যেকটী পদ্ধতি সাধক-সমাজে আদৃত হইয়াছে এবং প্রত্যেক পদ্ধতির মধ্য দিয়েই উপাসকেরা যুগে যুগে চরম-চরিতার্থতা লাভ করিয়া পরমা শান্তি পাইয়াছেন। সুতরাং বলিতেই হইবে, ইহাদের একটী পদ্ধতিও বৃথা নয়। বিভিন্ন জনের জীবনে বিভিন্ন সাধনা-ধারা বহিয়াছে কিন্তু পরমাত্মার আনন্দ-সাগরে প্রত্যেকটী ধারা গিয়া পড়িয়াছে। তাই সমগ্র জগৎ ব্যাপিয়া একটী মাত্র নির্দ্দিষ্ট সাধনা-পদ্ধতির প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা অসম্ভব এবং মূর্খতা। জগতের ইতিহাস অন্বেষণ করিয়া দেখ, ইহার অকাট্য প্রমাণসমূহের অভাব হইবে না। নির্দ্দিষ্ট একটী উপাসনা-পদ্ধতিতে বিশ্বাসবান্ ব্যক্তি বা সঙ্ঘ জগতের প্রত্যেকের দ্বারা সেই পদ্ধতির অনুষ্ঠান করাইবার জন্য জেদ্ করিয়া জগতে যে কত অশান্তি ও অধর্ম্ম আনিয়াছে,

তাহার ইয়ত্তা নাই। ভিন্ন মতাবলম্বীকে স্বমতে আনিবার জন্য অস্ত্রের ঝঞ্ঝনা এবং শোণিত-তর্পণের দৃষ্টান্তও বিরল নহে। কিন্তু তাহা কি নিজ উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে পারিয়াছে, না পারিবে?

যত মত, তত পথ। যে যেমন ভাবে উপাসনা করুক না, উপাসনাকালে উপাস্যের সান্নিধ্য সে উপলব্ধি করেই। সাঁওতালী ভক্ত যখন কিম্ভূত কিমাকার বিরূপ প্রস্তর-মূর্ত্তিকেই সৃষ্টিকর্ত্তা এবং সর্ব্বস্বামী জানিয়া প্রেমভরে যুগ্ম-কুক্কুট উৎসর্গ করেন, তখন তিনি যেমন তাঁর দেবতার সান্নিধ্য উপলব্ধি করিয়া রোমাঞ্চিত-কলেবর ও প্রেমাশ্রুসিক্ত হন, সগুণোপাসনার শ্রেষ্ঠ-অবস্থা-প্রাপ্ত একজন অসীম-ব্রহ্মোপাসক তেমনিই সান্নিধ্য উপলব্ধি করেন। অথবা নির্গুণোপাসকও ভগবৎ-সান্নিধ্য তেমনই লাভ করেন। এখানে প্রার্থক্য নাই। তবে সাধনের সূক্ষ্মতা-প্রযুক্ত বহির্বিকাশ এবং সান্নিধ্যের নিবিড়তায় প্রভেদ থাকে সত্য। কিন্তু সাধনের সূক্ষ্মতা লাভও সাধন-সাপেক্ষ। নীচ হইতেই উপরে উঠিতে হয়, স্থূল হইতেই সূক্ষ্মে যাইতে হয়। যাঁহার পক্ষে স্থূলের কাজ ফুরাইয়াছে, তিনি ত' সূক্ষ্মে যাইবেনই, তাহাতে বাধা দিবে কে? যাহার পক্ষে স্থূলের কাজ শেষ হয় নাই, তাহাকে জোর করিয়া সূক্ষ্মে টানিয়া আনিতে চাহিলে টানাটানিতে তার প্রাণ বাঁচাই দায় হইবে। সকলেই নিজ নিজ মত ও বিশ্বাসকে শ্রেষ্ঠ ও সূক্ষ্ম মনে করিয়া অপরকে

তথাকথিত অপকৃষ্ট ও স্থূল আবর্জ্জনা হইতে রক্ষা করিতে চাহিয়াছে,—ইতিহাস এই কথা বলে। কিন্তু তাহাদের সেই জোর করিয়া টানাটানি সার্থক হইল কোথায়? কত অনাচরণীয় শূদ্র যজ্ঞোপবীত ধারণ করিয়াও যথার্থ ব্রাহ্মণ হইল না। কারণ, জোর করিয়া ব্রাহ্মণত্ব লাভ করা যায় না, তাহা তপোলভ্য। কত ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণের হিন্দু সাম্য লাভ করিবার সঙ্কল্পে খৃষ্টান হইয়াও পারিয়া বা পঞ্চম জাতীয় খৃষ্টানদের সহিত একাসনে বসিল না। কত জন মনে-জ্ঞানে অদ্বিতীয়ের উপাসক ও ব্রহ্মজ্ঞানী হইয়াও প্রকৃত প্রস্তাবে স্বমত-নিন্দিত প্রতীক সম্যক্ বর্জ্জন করিল না। ইহার কত দৃষ্টান্ত দিব?

সুতরাং উপাসনার কোনও নির্দ্দিষ্ট পদ্ধতি অবলম্বন করিতে তোমাকে আমি ইঙ্গিত করিব না। জানিবার জন্য ব্যগ্র হও, বুঝিবার জন্য আকুল হও, দিব্য-দর্শনের ন্যায় তোমার সহজাত সাধন তোমাতে জাগ্রত হইবে। হয়ত কোনও মনুষ্য-রূপ-ধারী ভগবানের করুণা-বিগ্রহ, তাহা তোমাতে জাগাইবার উত্তেজক কারণ হইবেন। নতুবা তোমার অশেষ সৌভাগ্যো-দয়ের প্রমাণ-স্বরূপ তোমাতে তাহা সর্ব্ব-নিরপেক্ষভাবে স্বতঃসিদ্ধরূপে জাগ্রত হইবে।

——

একাদশ পরিচ্ছেদ

স্বাধ্যায়-সেবা

উপাসনান্তে কিয়ৎকাল স্বাধ্যায়-সেবা করিবে. অর্থাৎ সুযোগ-সুবিধা অনুসারে বেদাদি, উপনিষৎ, গীতা, যোগবাশিষ্ঠ-রামায়ণ প্রভৃতি এবং প্রাচীন ও বর্ত্তমান যুগের মহাপুরুষগণের প্রণীত তত্ত্বোপদেশ-ভূয়িষ্ঠ ধর্ম্মগ্রন্থ নিয়মিতভাবে অধ্যয়ন করিবে। দীর্ঘকাল না পার. অন্ততঃ একটা করিয়া শ্লোকও অর্থ বুঝিয়া অধ্যয়ন করিলে প্রভূত উপকার হইবে। অর্থ না বুঝিয়া চন্দনভারবাহী গর্দ্দভ-নন্দনের ন্যায় ভারে ভারে শাস্ত্রগ্রন্থ বহন করিলে তাহাতে কোন লাভ নাই। "আবৃত্তিঃ সর্ব্ব-শাস্ত্রাণাং বোধাদপি গরীয়সী"—কথাটা সাধারণতঃ পরীক্ষায় কৃতিত্ব-লোভী ছাত্রেরই জন্য, যথার্থ মনুষ্যত্বলাভ-প্রয়াসীর জন্য নয়। মুখস্থ-বিদ্যা মুখেই থাকে, কণ্ঠের নিম্নদেশে আর অবতরণ করে না; হৃদয়কেও স্পর্শ করে না, পরিপাকও পাইতে পারে না। শাস্ত্রীয় শ্লোক-সমূহের নিগূঢ়ার্থ বুঝিবার জন্য প্রত্যহই সামান্য একটু করিয়া সময় ক্ষেপণ করিলে ক্রমশঃ মস্তিষ্কের এমন এক অভিনব গঠন হইয়া যায় যে, কূটার্থপূর্ণ বিষয়সমূহও সহজে অধিগত করিবার সামর্থ্য জন্মে। শাস্ত্রকার কি বলিতে চাহিতেছেন, তিনি যে ভাষা প্রয়োগ করিয়াছেন, সেই ভাষার অন্তরালে গভীরতর কি অর্থ নিহিত রহিয়াছে, অন্যের সহায়তা না নিয়া নিজে নিজে চেষ্টা করিয়া এইসব বুঝিতে অভ্যাস করিলে তাহাতে স্বাধীন চিন্তার প্রসার

হয়, মস্তিষ্কের ক্ষমতা বর্দ্ধিত হয় এবং অর্থগ্রহণের অভিনিবেশের সাথে সাথে শ্লোকসমূহ বিনা চেষ্টাতেই স্মৃতি-ফলকে আপনি গ্রথিত হইয়া যায়।

স্বাধ্যায়ে শ্রদ্ধা, অভিনিবেশ ও বিচার

স্বাধ্যায় দ্বারা একধার হইতে উপদেশ গিলিতে পারিলেই তাহার সার্থকতা হইল না। যে উপদেশটি লাভ করিলে, তাহা যদি তোমার জীবনের কর্ম্মে অনুষ্ঠিত না হয়, তাহা হইলে উহা তোমার পক্ষে ব্যর্থ হইল। সুতরাং স্বাধ্যায়কালে চিত্তকে স্থির, দেহকে অচঞ্চল এবং সর্ব্বতোভাবে শুদ্ধসত্ত্ব ও শ্রদ্ধান্বিত রাখিবে। সর্ব্বদা মনে রাখিও,—"শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানম্।" অশ্রদ্ধায় শ্রুত বা পঠিত অমৃতোপম জীবন-প্রদায়ক উপদেশও হীন-শক্তি হইয়া পড়ে। সুতরাং তোমার পক্ষে গ্রহণ-যোগ্য হউক বা না হউক, যাহাই অধ্যয়ন করিবে, তাহাই স্থির চিত্তে শ্রদ্ধার সহিত করিবে এবং তোমার জীবন এই উপদেশ পালনের প্রয়োজন আছে কিনা, ইহা তোমার জীবনকে সত্য ও সুন্দর আদর্শে গঠিবার উপযোগিতা রাখে কি না, ইহা তোমার জীবনে কতটা অনুসৃত হইয়াছে এবং আরও কতটা অনুসৃত হওয়া প্রয়োজন, এই উপদেশ প্রতিপালনে তোমার কি কি বাধা, সেই সকল বাধা দূর করারই বা কি কি উপায় আছে, বাধা দূরীকরণে তুমি কতটা অধ্যবসায়সম্পন্ন হইয়াছ, ইত্যাদি আলোচনা পূর্ব্বক প্রত্যেকটী শ্লোক বা বাক্য-পা

সমাপ্ত করিবে। শাস্ত্র সমূহে ধর্ম্মাধর্ম্ম ন্যায়ান্যায় সম্বন্ধে বহুবিধ মত-পার্থক্য আছে, কোথাও কোথাও একই ঋষি বিভিন্নস্থলে বিভিন্ন বিরুদ্ধ উপদেশ প্রদান করিতেছেন। এই মত-পার্থক্য কেন হইল, কোন অবস্থায় কে কি কথা বলিলেন, তোমার জীবনের নির্দ্দিষ্ট আদর্শের পরিসমাপ্তিকল্পে কাহার কোন্ কথা হিতকর, তাহা বিচারপূর্ব্বক অধ্যয়ন করিলে, অধ্যয়নই একটা তপস্যা হইয়া যায় এবং তাহাতে আত্মার অবগুণ্ঠিত অমিত শক্তি অভিব্যক্ত হইতে থাকে। মনে রাখিও, ঋষি-মস্তিষ্কপ্রসূত তত্ত্বজ্ঞানপূর্ণ গ্রন্থাদি কি বিদ্যালয়-পাঠ্য বিবিধ বিষয়পূর্ণ পুস্তকাদি, এমন কি সংবাদপত্রাদি পর্য্যন্ত সকলই শ্রদ্ধা, অভিনিবেশ ও বিচার এই তিনের সমন্বয়ে অধিগত করিতে হইবে। তবেই "ছাত্রাণাম্ অধ্যয়নং তপঃ"—কথাটা স্বীকার করা হইবে। নতুবা পাণ্ডিত্য ফলাইবার জন্য শ্লোক মুখস্থ করিলে এবং পরীক্ষায় বেশী নম্বর পাইবার জন্য মা সরস্বতীর কণ্ঠে দড়ি বাঁধিয়া তাঁহাকে তোমার কণ্ঠে ঝুলাইয়া রাখিলেই তাহাকে তপস্যা বলিব না; উহা বুদ্ধি-বৃত্তির ব্যভিচার মাত্র।

স্বাধ্যায়ের উদারতা

স্বাধ্যায় সম্বন্ধে যতদূর সম্ভব উদার হইতে চেষ্টা করিবে। সবল-চিত্ত ব্যক্তির হিন্দু হইয়াও কোর্‌আন্ বা বাইবেল পাঠকে স্বাধ্যায়-শ্রেণীভুক্ত করিয়া লইতে দ্বিধা বোধ করা নিষ্প্রয়োজন। অথবা কোনও মুসলমান বা খ্রীষ্টান বন্ধু গীতা প্রভৃতি পাঠ

করিতে চাহিলে অথবা তাহার তত্ত্ব শুনিতে চাহিলে, তাহাকে অবাধ অধিকার ও সুযোগ দিতে কৃপণ বা কুণ্ঠিত হইও না। তবে কথা এই যে, যে-ধর্ম্মাবলম্বী পিতামাতার ঔরসে ও গর্ভে তোমার দেহের জন্ম হইয়াছে এবং যে-ধর্ম্মাবলম্বী সমাজের মধ্য দিয়া তোমার বয়ঃক্রম বাড়িয়াছে, সে ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় গ্রন্থ পূর্ব্বে অধ্যয়ন না করিয়া অন্যান্য ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তকগণের উপদেশ পড়িতে গেলে সকল সময় হয়ত তাঁহাদের বক্তব্যের সারমর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারিবে না এবং নিজের নিরপেক্ষ বিচার-বুদ্ধি পরিভ্রষ্ট হইবারও যথেষ্ট সম্ভাবনা রহিয়াছে। ফলে, অসত্য ও অশান্তি তোমাকে বিপর্য্যস্ত করিবে। আরও এক কথা যে, তোমার পিতৃপুরুষগণের মধ্যে যে সাধনার ধারা চলিয়া আসিতেছে, তোমার দেহে এবং মনে তাহার একটা অলোপ্য চিহ্ন অঙ্কিত রহিয়া গিয়াছে। এই চিহ্ন ধরিয়া পথে অগ্রসর হওয়াই অধিকাংশের পক্ষে স্বাভাবিক ও কল্যাণজনক। কাহারও কাহারও পক্ষে পূর্ব্বপুরুষের সাধনা-ধারা ধরিয়া চলা অনাবশ্যক হয়, কিন্তু তেমন ক্ষণজন্মা মহান্ শক্তিশালী পুরুষ অতি অল্পই অবতীর্ণ হন। সুতরাং জন্মের দ্বারা যে ধর্ম্মকে লাভ করিয়াছ, তাহার সম্বন্ধে মোটামুটি জ্ঞানলাভ হইবার পূর্ব্বে নহে, পরন্তু পরে অপর ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় শাস্ত্রাদি পাঠ করিবে। তাহাতে প্রকৃত ধর্ম্মের সহিতও বৃথা আনুষ্ঠানিক যে কতকগুলি গোঁড়ামি চিরকাল জগতের মানুষ সঞ্চয় করিয়া আসিয়াছে, তাহা টুটিয়া যাইবে।

পরমত-সহিষ্ণুতা

সাধারণতঃ আমরা ধর্ম্ম বলিতে বহির্ম্মুখ কতকগুলি আচার-ব্যবহারই বুঝিয়া থাকি কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে ধর্ম্ম তাহা নহেন। যাহা প্রকৃত ধর্ম্ম, তাহা একমাত্র স্বানুভূতিলভ্য, অপরে তাহা লাভ করাইয়া দিতে পারে না বা তাহা প্রদর্শন করিতে পারে না। যাঁহারা নিজ নিজ জীবনে ধর্ম্মকে লাভ করিয়া চরিতার্থ হইয়াছেন, তাঁহারা ধর্ম্মলাভের পন্থামাত্র প্রদর্শন করিতে পারেন। বিভিন্ন জন বিভিন্ন পন্থার অনুবর্ত্তন করিয়া ধর্ম্মকে লাভ করিয়াছেন বলিয়া বিভিন্ন জন বিভিন্ন পন্থার উপরে জোর দিয়া তাহা প্রচার করিয়াছেন,—সেই জন্যই আপাততঃ বিভিন্ন ধর্ম্মের পার্থক্য দৃষ্ট হইতেছে। কিন্তু যথার্থ পক্ষে ধর্ম্ম কখনও বিভিন্ন হন না, তিনি এক, অদ্বিতীয়, শাশ্বত সনাতন ও অবিমিশ্র। এই ধর্ম্মকে লাভ করাই আমাদের একমাত্র সার্থকতা,—এক্ষণে যে যেমন করিয়া লাভ করিতে পারেন করুন, আপত্তি করিবার কিছু নাই। আমি যাহাকে আমার পক্ষে ধর্ম্ম লাভের পন্থা মনে করিতেছি তাহাতে কেহ আসিয়া বাধা না দিলেই যথেষ্ট। যাঁহারা জীবনে ধর্ম্মকে লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহারা কে কোন্ পথে গিয়াছিলেন, তাহার ঠিক্‌ঠিক্ সীমাটা নির্দ্দেশ করিবার জন্যই আচার-নিয়ম প্রভৃতির গণ্ডী বাঁধিয়া দিয়াছেন। উহা দ্বারা আমরা তাঁহার পন্থাকে ধরিতে পারি। নিজ ধর্ম্ম-পথ অনুসরণ করিতে করিতেও অপরের ধর্ম্মপথ

জানাটা দোষের নহে। কারণ, যদিই আমি আমার নির্দ্দিষ্ট পথে চলিতে চলিতেই অপরের পথের নিশানার মধ্যেও আমার পথের সংবাদ পাই? আশ্চর্য্য ত' নহে! হিমালয় ভ্রমণ করিতে গিয়া অনেক ভ্রমণকারী অষ্ট্রেলিয়ার বৃত্তান্ত লিখিয়াছেন, আবার ব্যোমযানে আকাশ ভ্রমণে বহির্গত হইয়া অনেক বিমান-বীর পদব্রজে পৃথিবী পর্য্যটনের কথার অবতারণা করিয়াছেন। যোগশাস্ত্রে প্রেমের কথা আছে আবার ভক্তিশাস্ত্রেও জ্ঞানের কথা আছে। সুতরাং নিজ নিজ পন্থার স্পষ্টতর অভিজ্ঞান জন্মিবার জন্য ভিন্নমতাবলম্বীর শাস্ত্রপাঠও উপকারী এবং সত্যানুসন্ধিৎসুর ব্রত-পোষক। **কিন্তু ইহা দুর্ব্বলমনা ব্যক্তির পক্ষে ব্রতনাশক।** নিজ ধর্ম্মে নিষ্ঠাহীন ব্যক্তির পক্ষে নিজ ধর্ম্মে নিষ্ঠাবর্দ্ধনই প্রথমে প্রয়োজন, অপরের ধর্ম্ম আলোচনা তার পক্ষে বিপজ্জনক।

স্বাধ্যায়ের প্রচার

নীচ জাতীয় হউক বা উচ্চকুলের হউক, বা তোমার বন্ধু-বান্ধবগণ সকলেই যাহাতে স্বাধ্যায় সম্পন্ন হইয়া উঠে, এই জন্য একান্ত ভাবে অধ্যবসায় করিবে। তাহাতে তোমার বিস্তর লাভ। বিশুদ্ধ উপদেশ গ্রহণের দ্বারা প্রত্যেকে সৎ স্বভাব-সম্পন্ন হইয়া উঠিলে সৎসঙ্গ তোমার পক্ষে সুলভ হইবে এবং সর্ব্বদা সদালোচনা দ্বারা নিষ্ঠা, উৎসাহ ও অভ্যাস অবিচল রাখিবার সহায়তা জন্মিবে। যে সৎকার্য্যটী নিজে অভ্যাস

করিবে, অপর দশ জনকে দিয়া যদি তাহা করাইতে পার, তাহা হইলে দেখিবে, তোমার ব্যক্তিগত উন্নতি সাধনেই তুমি কত বেশী মনোবল ও একাগ্রতা প্রাপ্ত হইবে। আবার আর একটী মজা এই যে, তুমি নিজে অভ্যাস আরম্ভ করিয়া যদি অপরকে অভ্যাস করিতে বল, সহজে লোকে তোমার কথা ধরিবে এবং তদনুযায়ী কার্য্য করিবে। শূন্যগর্ভ বক্তৃতার অপেক্ষা আদর্শের মূল্য চিরকালই বেশী, জগতের ইতিহাসে এবং আমার তোমার প্রত্যেকের দৈনন্দিন ইতিহাসে ইহার ভূরি ভূরি পোষক প্রমাণ পাওয়া যাইবে। সুতরাং সাবধান, নিজে যাহা কর না, বন্ধু বান্ধবগণকে সেই বিষয়ে বলিতে যাইও না; গেলে তাহা বৃথা ত' হইবেই, তোমার মধ্যেও একটা অনাহূত গুরুগিরির ভাব জাগিয়া উঠিয়া তোমার উন্নতির সকল পথেই কাঁটার বেড়া বাঁধিয়া দিবে। বর্ত্তমান সমাজের পক্ষপাতপুষ্ট অথবা আরও সত্য করিয়া বলিলে পক্ষপাত-দুষ্ট, বিচারে যাহারা অস্পৃশ্য, অন্ত্যজ, অনাচরণীয়, তাহাদের মধ্যেও স্বাধ্যায়াদি সাত্ত্বিক সাধনের প্রসার ঘটিতে দেখিলে, হাতী চলিলে যেমন কুকুর ঘেউ ঘেউ করিয়া উঠে, ঠিক তেমনই একদল লোক ঘেউ করিয়া উঠিবেন। কেহ বা অনুষ্টুপ্ ছন্দের সত্য-মিথ্যা নানারূপ শ্লোক আওড়াইয়া শূদ্র স্ত্রী ও ম্লেচ্ছ (অর্থাৎ অহিন্দু) প্রভৃতির বেদাদি অধ্যয়নের নিষিদ্ধতা প্রমাণ করিয়া ঘন ঘন টিকির আস্ফালন করিবেন। কোথাও বা কেহ কেহ সনাতন ধর্ম্মরক্ষা-

কল্পে মুষ্টিযোগের যে সনাতন ব্যবস্থা রহিয়াছে, তাহাই প্রয়োগ করিতে চাহিবেন। কিন্তু তাঁহাদের প্রতি দৃক্‌পাত মাত্রও করিও না। যাহাকে সত্য বলিয়া জানিবে, নির্ভীক-হৃদয়ে তাহা ব্যক্ত করিবে, নিঃসন্দিগ্ধে, অদ্বিধায় তাহা সম্পাদন করিবে। যদি বুঝিয়া থাক, পৈতৃক সম্পত্তির ন্যায় জ্ঞান কাহারও একচেটিয়া অধিকার নহে, তবে নারী-পুরুষ না বাছিয়া, ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল না মানিয়া, হিন্দু-অহিন্দু বিচার না করিয়া তাহা সকলের মধ্যে সমভাবে বিলাইয়া দাও। যাহারা চাহে না, তাহাদের উপর জবরদস্তি করিয়া, জ্ঞানের প্রসার করিতে চাহিও না; কিন্তু যাহারা চাহে, তাহারা যে-জাতির, যে-কুলের, যে-ধর্ম্মের, যে-অবস্থারই হউক না কেন, নির্ব্বিশেষে জ্ঞান তাহাদিগকে দিতে হইবে। সনাতন ধর্ম্ম রক্ষার নাম করিয়া অসত্যের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া কয়দিন চলিবে? মিথ্যা ব্রাহ্মণত্বের বড়াই লইয়া আজিকার সমাজপতি কয়দিন তাঁর উচ্চ আসন বজায় রাখিতে পারিবেন? নাটকীয় অভিনয়ে সনাতন ধর্ম্ম রক্ষা হয় না, সনাতন ধর্ম্ম রক্ষার প্রধান উপায় উদারতা, সাম্য, সর্ব্বত্র প্রীতি, সর্ব্বজনীন সৌভ্রাত্র্য। তাহা না অবলম্বন করিয়া কেবল প্রতিবাদ করিলে সে কথা শুনিবে কে? আর কোন্ গরজেই বা শুনিবে? অবশ্য, জ্ঞানের অবাধ বিস্তারের ও সাধনের নির্ব্বিচার প্রসারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ আজিকার নয়।

পূর্ব্বে যাহা চলিয়াছে, তাহা চলিয়াছে। অতীতের দোহাই

দিয়া বর্ত্তমানকে জড়ভরত করিয়া রাখিতে আর ত' পারি না। এক অপূর্ব্ব সমন্বয়-সাধনের দ্বারা বর্ত্তমান যুগকে সর্ব্বথা সুন্দর এবং সুগঠিত করিয়া তুলিতে হইবে। এই জন্য জগতের প্রত্যেক সভ্যতার কাছ হইতে সৌন্দর্য্য কুড়াইয়া আনিতে হইবে। কিন্তু নব-যুগের নবীন সভ্যতার মেরুদণ্ড হইবে, সম্পূর্ণ-রূপে ভারতীয়। ভারতীয় ভিত্তির উপরে জগতের সর্ব্বযুগের সর্ব্বদেশের সর্ব্ববিধ সভ্যতার শ্রেষ্ঠ সম্পদে, শ্রেষ্ঠ শিল্পীর শ্রেষ্ঠ প্রয়াসে জগদ্ধাত্রী-পূজার মন্দির নির্ম্মিত হইবে। কিন্তু একথা ভুলিলে চলিবে না যে, ভারতীয় মেরুদণ্ড চাই-ই অথচ অতীত যুগের সকল কিছুই যে আজিকার দিনে উপযোগী, তাহা নহে।

——

আস্বাদন চাহ যদি
করহ সাধন,
বিনা যত্নে নাহি মিলে
অমূল্য রতন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বের কর্ত্তব্য

ব্যায়াম, প্রাতঃস্নান ও উপাসনা সবই সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে সমাপ্ত করিতে চেষ্টা করিবে। সূর্য্যোদয়ের পরে ব্যায়ামে শরীরের শ্রান্তি অপনোদনে বিলম্ব হয়, সূর্য্যোদয়ের পরে স্নানে বায়ুবৃদ্ধি ঘটে; ফলে উপাসনায় মন তাদৃশ গভীর ভাবে অভিনিবিষ্ট হয় না। সুতরাং এই তিনটীই সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে সম্পাদিত হওয়া আবশ্যক।

অধ্যয়ন ও স্বাস্থ্য

সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই স্বাধ্যায় এবং তদনন্তর বিদ্যালয়ের অধ্যয়নাদি আরম্ভ করা সঙ্গত এবং অধিক বেলা হইবার পূর্ব্বেই তাহা সমাপ্ত হওয়া প্রয়োজন। বেলা-বৃদ্ধির সময়ে মস্তিষ্কের পরিশ্রম, মস্তিষ্কের বৃদ্ধি ও সুস্থতার পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিজনক, মনে রাখিবে। স্কুলে আর আর ভাল ছেলেদের সঙ্গে টক্কর দিয়া বেশী নম্বর রাখিবার জিদে পড়িয়া কখনও যেন মস্তিকের উপরে অবৈধ অত্যাচার করিও না। জীবন-গঠনের সময়ে যদি ক্লাশে প্লেস্ রাখিবার মোহে মস্তিষ্ককে দুর্ব্বল করিয়া ফেল, তাহা হইলে পরে হা-হুতাশ করিতে হইবে। যাহারা বাল্যে, কৈশোরে এবং যৌবনে মস্তিষ্ককে অবিকৃত ও সুস্থ রাখিয়া

কাজ করিয়াছেন, প্রৌঢ়ে এবং বার্দ্ধক্যে তাহাদের মেধা-মনীষার এমন পরিস্ফুটন হইয়াছে যে, জগৎ অবাক্ হইয়া তাঁহাদের পানে সসম্ভ্রমে চাহিয়াছে। বিলাত প্রভৃতি দেশে বালক এবং যুবকেরা পড়ার জন্য কখনও অভিভাবকের দ্বারা তাড়িত হয় না, অভিভাবকেরা দিনরাত কেবল সে কথাই ভাবেন যে, কিসে ছেলেগুলির স্বাস্থ্য ভাল থাকে, দেহ সবল হয়, মাংসপেশী লৌহদৃঢ় হয়, বক্ষ প্রশস্ত হয়, সাহস অপরিমেয় হয়। আর আমাদের দেশে ঠিক্ তাহার বিপরীত। যে বিদ্যা অর্জ্জন করিলে গোলামী করা ছাড়া অন্য কোনও কাজের যোগ্যতা জন্মে না, আমাদের দেশের বাপ-মায়েরা ঠিক্ তাহারই জন্য ছেলেদের স্বাস্থ্য, পরমায়ু, সুখ, শক্তি এমন কি ইহ-পরকাল বলি দিতে ইতস্ততঃ করেন না। সুতরাং এই বিষয়ে তোমাদিগকেই একটু সজাগ থাকিতে হইবে। সর্ব্বদা মনে রাখিবে, সব ভাল, যার শেষ ভাল। পরীক্ষায় আজ দুইটা নম্বর পাওয়ার চেয়ে জীবনের প্রকৃত সংগ্রাম-ক্ষেত্রে বিজয়ী বীর পুরুষ হওয়ার মূল্য লক্ষগুণ বেশী। আমাদের দেশে দুই একজন কচিদ্দৃষ্ট পুরুষ ব্যতীত আর সকল মেধাবীরা চল্লিশ পঞ্চাশের পূর্ব্বেই ইহলীলা সাঙ্গ করিয়া থাকেন। আর, চাহিয়া দেখ য়ুরোপ আমেরিকার দিকে, তাহাদের দেশের মেধাবী পুরুষেরা কেহ আশী, নর্ব্বই, কেহ কেহ এমন কি একশত বৎসর পর্য্যন্ত বাঁচিয়া সুদীর্ঘ জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত

দেশের ও জগতের সেবায় সার্থক করিতেছেন। শুধু তাই নয়, পাশ্চাত্য জগতের অধিকাংশ মনীষী ব্যক্তি বাল্যে বা যৌবনে নিতান্ত সাধারণ বুদ্ধির লোকই ছিলেন। স্বাস্থ্যকে রক্ষা করিবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা দ্বারা তাঁহারা তাঁহাদের শক্তিকে অত্যাচার ও অপচয় হইতে রক্ষা করিয়া শেষে অল্পপুঁজীর বলেই বড় রকমের প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিয়াছেন।

অধ্যয়ন ও জলযোগ

উপাসনার পরে কিছু জলযোগ না করিয়া অধ্যয়নাদি আরম্ভ করিবে না। ক্ষুধার্ত্ত অবস্থায় মস্তিষ্কের শ্রম করা আর, স্বেচ্ছায় মৃত্যুকে আহ্বান করা একই কথা। জলযোগ সম্বন্ধে অবস্থানুসারে ব্যবস্থা করিবে। দরিদ্র দেশের দরিদ্র পাঠার্থীকে আহার্য্য-দ্রব্যের সুদীর্ঘ তালিকা দিতে যাওয়া হৃদয়হীনতারই পরিচায়ক হইবে। জলযোগের কিয়ৎকাল পূর্ব্বে শরীরের অবস্থানুসারে আদা-সৈন্ধব, পাটপাতা-ভিজান জল, চিরতার জল, ত্রিফলা, ঋতু-হরীতকী, ব্রাহ্মীশাকের রস প্রভৃতি নিয়মিত ভাবে সেবন হিতকারী। প্রত্যহ এক গ্লাস শীতল জলের সহিত একটী কি দুইটী করিয়া কাগজী লেবুর রস মিলাইয়া প্রাতঃকালে সেবন করিতে পারিলে ম্যালেরিয়া-প্রধান ছাত্রগণের বিশেষ উপকার হইবে। কাঁটানটের (ক্ষুদে কাঁটা বা কাঁটাক্ষুদুরে) মূল তুলিয়া তৎসঙ্গে সিকি পরিমাণ গোলমরিচ এবং অষ্টমাংশ

সৈন্ধব লবণ মিশ্রিত করিয়া বাটিয়া একআনা পরিমাণ বটী প্রস্তুত করতঃ প্রত্যহ প্রাতে তাহার একটী চিরতার জল সহ সেবন করিলে শরীরস্থ ম্যালেরিয়া-বিষের ক্রিয়া ক্রমশঃ কমিতে থাকে বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে।

অধ্যয়ন ও আসন

অধ্যয়ন করিতে সর্ব্বদাই কোনও একটী সুখপ্রদ আসন করিয়া বসিবে। বাকা কোঁকা হইয়া বসিলে মনঃস্থির হয় না, একবারের পড়া দশবার পড়িতে লাগে। পড়িবার সময়ে, শুধু পড়িবার সময় কেন, সকল কাজের সময়েই মনে রাখিবে, যাহা অন্যে এক ঘণ্টায় করিতে পারে, তোমাকে তাহা দশ মিনিটে করা চাই। এইরূপ জিদ্ রাখিয়া কাজ করিতে চেষ্টা করিলে ছয় মাস মধ্যে তুমি দেখিবে যে, সকল কাজই তুমি অন্যের অপেক্ষা অনেক অগ্রে সমাপ্ত করিতে পার। জগতে যোগ্যতারই সমাদর, সংগ্রাম-ক্ষেত্রে বিজয়লক্ষ্মী যোগ্য ব্যক্তিরই অঙ্কশায়িনী হন।

মেরুদণ্ডের সরলতার আবশ্যকতা

পড়িতেই বস, ধ্যান করিতেই বস, আর আহারেই বস, কিংবা দশজনের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলিতেই বস, যখনই বসিবে, তখনই মেরুদণ্ড সোজা রাখিয়া বসিবে। প্রথম প্রথম ইহা

একটু কষ্টজনক মনে হইবে বটে, কিন্তু মাসেক কাল অভ্যাসের পরেই ইহার উপযোগিতা বুঝিতে পারিবে। মেরুদণ্ড সরল থাকিলে মেরুমধ্যস্থ মজ্জাস্রোত স্বাভাবিকভাবে বহিয়া দেহকে শক্তিশালী করে, ফুস্‌ফুসের ক্রিয়ায় কোনও প্রকার ব্যাঘাত হয় না বলিয়া হৃৎপিণ্ডের কার্য্য অবাধে চলে, বিশেষতঃ মেরুদণ্ড সরল করিয়া বসিবার অভ্যাস করিলে কামদমন সহজ হইয়া পড়ে।

গৃহের পরিচ্ছন্নতা

অধ্যয়ন, ব্যায়াম. শয়ন এবং আহারের গৃহ সর্ব্বদা পরিষ্কৃত পরিচ্ছন্ন রাখিবে ; যাহাতে বায়ু-চলাচলের পন্থা উন্মুক্ত থাকে, তার ব্যবস্থা করিবে। অধ্যয়ন-কক্ষে দেশ-প্রসিদ্ধ বিদ্বানদের চিত্র রক্ষা করিবে, কিন্তু যে সকল বিদ্বানদের নৈতিক চরিত্র কলুষিত, তেমন ব্যক্তির চিত্র একেবারে দূর করিয়া দিবে। ব্যায়াম-গৃহে রামমূর্ত্তি, গামা, গোবর, স্যাণ্ডো প্রভৃতি ব্যায়াম-শিল্পী এবং মল্লবীরদের চিত্র রক্ষা করিবে। শয়ন-গৃহে পরার্থে আত্মত্যাগী, সর্ব্বভূতহিতে-রত, ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত-সিদ্ধ, ঈশ্বর-সাক্ষাৎ-কারলব্ধ মহাপুরুষগণের চিত্র রাখিবে এবং ফুল-মাল্যাদির দ্বারা ইঁহাদের পূজাদিও করিবে। পৌত্তলিকতা বলিয়া লোকে নিন্দা করিতে পারে,—গ্রাহ্য করিও না। বীরপূজা দেশ হইতে অন্তর্দ্ধান করিয়াছে বলিয়াই আজ আমরা ক্লীব কাপুরুষের মত হইয়া রহিয়াছি। ধর্ম্মবলে বলীয়ান্ হইয়া

যাঁহারা জগতের অকল্যাণ-নাশ করিয়াছেন, তাঁহাদের পূজা করিতেই হইবে। অপরে বাধা দেয়, দেউক। আহারের গৃহেও চিত্র রক্ষা করিতে পারিলে ভাল। তবে এমন ব্যক্তির চিত্র রক্ষা করিবে, যিনি জীবনে ছিলেন অল্পাহারী, অথচ করিয়াছেন জগতের অনেক কাজ। দৃষ্টান্তস্বরূপ মহাত্মা গান্ধীকে ধরিতে পার।

অধ্যয়ন-গৃহে কাগজের টুকরায় বড় অক্ষরে এইরূপ সব মহাবাক্য লিখিয়া রাখিবে,—

"বিদ্যার্থং ব্রহ্মচারী স্যাৎ।"

"বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে।"

ব্যায়াম-গৃহে লিখিবে,—

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।"

শয়ন-গৃহে লিখিবে—

কতকাল রবে আর
ঘুমে অচেতন,
জীবন বৃথায় গেল,
না হ'ল সাধন।

আহারের গৃহে লিখিবে—

যে আহার না করিল বীর্য্যের বর্দ্ধন,
কে বলে আহার তাহা? পুরীষ-ভক্ষণ।

মহাবাক্য-সমূহের সার্থকতা

সম্ভবতঃ তোমাদের শয়ন, ব্যায়াম ও অধ্যয়ন একই গৃহে হয়। সুতরাং উপরোক্ত চিত্র ও কথা একগৃহ মধ্যেই রক্ষা করিবে। মাঝে মাঝে এক একটী চিত্র বা কথার দিকে অভিনিবিষ্ট চিত্তে দৃষ্টিপাত করিবে এবং চিত্রিত ব্যক্তির জীবনের মহত্ত্ব সম্বন্ধে অথবা লিখিত বাক্যের অর্থ সম্বন্ধে মনে মনে আলোচনা করিবে। তাহা যদি না কর, তাহা হইলে, বৈঠকখানা হইতে পায়খানা পর্য্যন্ত সকল জায়গাও যদি মহাপুরুষদের ছবি এবং মহাবাক্য সমূহে ঢাকিয়া ফেল, তাহাতেও কোন উপকার হইবে না।

এই প্রসঙ্গে একটী কথা অবশ্যই বলা প্রয়োজন যে, পূজার উপাসনার ঘরে বহু মূর্ত্তি, বহু প্রতীক বা বহু বাক্য থাকিবে না।

অধ্যয়ন ও মস্তিষ্কের শ্রম

অধ্যয়নকালে কখনও মস্তিষ্কের শ্রমবোধ করিলে ভগবানের নামে লাগিয়া যাইবে। মস্তিষ্কের অবসাদ দূর না হওয়া পর্য্যন্ত কোন ক্রমেই পুনরায় অধ্যয়ন আরম্ভ করিবে না। অধ্যয়নশেষে বেলা নয়টার মধ্যেই দ্বিপ্রহরের স্নান সমাপন করিবে। অনেকের প্রাতঃস্নানের পরে দ্বিপ্রহরের স্নান

প্রয়োজন হয় না, তাহাদের পক্ষে অন্ততঃ মাথাটা ভাল করিয়া ধুইয়া ফেলা উচিত। নতুবা বায়ুবর্দ্ধন হইতে পারে।

স্নান

স্নানকালে জলে নামিবার পূর্ব্বে বিশ্বস্রষ্টা পরমাত্মাকে প্রণামপূর্ব্বক বলিবে,—"হে পরমাত্মন্, তোমার মহিমায় জলরূপ জীবন আমারই প্রয়োজনে সৃষ্ট হইয়াছে, তোমাকে সহস্র প্রণিপাত।" তৎপর মস্তকে এক গণ্ডূষ জল সিঞ্চন করিয়া ধীরে ধীরে অবগাহন করিবে। মস্তকে জল না দিয়া জলে নামিলে রক্ত উর্দ্ধগামী হইয়া বিবিধ প্রকারের বায়ুরোগের উৎপাদন করে। সুতরাং এই বিষয়ে সর্ব্বদাই সতর্ক থাকিবে।

স্নানের সময়ে মনে মনে চিন্তা করিবে,—"প্রতিবিন্দু জল-স্পর্শে আমার দেহের শ্রান্তি, ক্লান্তি ও অবসাদ দূরীভূত হইয়া দেহে নববল ও নবোৎসাহের সঞ্চার হইতেছে, শ্রমোত্তেজিত রক্তকণাসমূহ সুশীতল সলিল-স্পর্শে শান্ত, স্নিগ্ধ ও সুখদ হইতেছে, মস্তিষ্কের স্নায়ুসমূহ সুস্থ ও সবল হইতেছে, মনের সর্ব্বপ্রকার মালিন্য ও পঙ্কিলতা এই জলে ধুইয়া যাইতেছে, রোগ, শোক, পাপ, তাপ ও অন্তর্দাহ আমাকে চিরতরে পরিত্যাগ করিতেছে এবং আমি নিত্যশুদ্ধ নির্ম্মল হইয়া অপার শান্তির অধিকারী এবং জগৎ কল্যাণে অধিকতর ক্ষমতাবান্ হইতেছি।"

প্রথম দুই চারি দিন ছেলে খেলার মতই মনে হইবে কিন্তু পরে দেখিও, এইরূপ স্নানের দ্বারা দেহ ও মনের প্রসন্নতা, প্রশান্তি ও প্রকর্ষ কিরূপ নিত্য নিত্যই উপচিত হয়। শুধু তাহাই নহে, অভ্যাসের দ্বারা তোমার এমন ক্ষমতা জন্মিবে যে, মরুভূমির উত্তপ্ত বালুকা বা অত্যুষ্ণ বায়ু-প্রবাহের মধ্যেও শ্রান্ত হইয়া যদি কল্পনায় মাত্র জলে অবগাহন করিয়াছ, এইরূপ চিন্তা করিতে থাক, তাহা হইলে সূর্য্যের শক্তি তোমার পক্ষে ব্যর্থ হইবে।

মাধ্যাহ্নিক উপাসনা

মাধ্যাহ্নিক স্নানের পরেও উপাসনা করিবে। উদ্বেগপূর্ণ কর্ম্মজীবন-যাপনকারীদের পক্ষে, বিশেষতঃ আধুনিক ছাত্রদের পক্ষে, মধ্যাহ্ন-উপাসনা জমাইয়া তোলার অন্তরায় অনেক। তথাপি হতোদ্যম হওয়া সঙ্গত নহে। আর, দুই চারি মিনিটের জন্য হইলেও অবশ্যই উপাসনায় বসিবে। অন্য কাজের ব্যস্ততা হেতু দীর্ঘ সময় উপাসনা না করিতে পারিলেও নিয়ম-রক্ষার একটা স্থায়ী সুফল আছে। কারণ, ইহা স্বভাবের ও রুচির মধ্যে সৎ-সংস্কার সৃষ্টি করে।

আহার

মাধ্যাহ্নিক উপাসনার পরে মুখ প্রক্ষালনাদি করিয়া আহারে বসিবে। যখনই যে বস্তু আহার কর, তাহার পূর্ব্বে

ও পরে উত্তমরূপে আচমন করিবে। অপবিত্র স্থানে, অপবিত্র আসনে ঘৃণাজনক আহার্য্য ভক্ষণ করিও না। অপ্রসন্ন, উদ্বিগ্ন বা কামক্রোধাদি দ্বারা বিচলিত চিত্তে কখনও আহার্য্য গ্রহণ করিবে না। আহার-সময়ে বাক্ সংযম অভ্যাস করিবে, একেবারেই মৌনী থাকিতে পারিলেই উত্তম, নতুবা একান্তই কথা কহিবার প্রয়োজন হইলে, সংক্ষেপে নিজ বক্তব্য শেষ করিবে।

আহারকালীন চিন্তা

আহার-সময়ে যেরূপ চিন্তা করিবে বা কথা কহিবে, আহার্য্য বস্তুসমূহ দেহকে ঠিক্ সেই ভাবেই গঠন করে, ইহা কখনও ভুলিও না। খাইতে বসিয়া বাজে গল্প করিলে আহার্য্য দ্রব্য নিতান্তই বাজে ভাবে দেহকে গঠন করে; কামচিন্তা বা কাম-কথা আলোচনা করিলে দেহকে সহজে কামলুব্ধ ও কামপ্রবণ করিয়া তোলে। খাইতে বসিয়া ক্রুদ্ধ হইলে বা ক্রুদ্ধ ব্যক্তির সম্বন্ধীয় কথা কহিলে, এমন কি তদ্বিষয়ে চিন্তা করিলে পর্য্যন্ত দেহ ক্রমশঃ সূক্ষ্ম প্রভাবে ক্রোধের মন্দিররূপে পরিণত হইয়া যায়। সুতরাং সাবধান! হেলায় খেলায় যাহারা জীবনটা কোনও ক্রমে আহার, নিদ্রা ও মৈথুনের সেবায় কাটাইয়া দিতে পারিলেই কৃতকৃতার্থ হয়, তাহাদের সংখ্যাবৃদ্ধি করিও না। সর্ব্বদা স্মৃতিতে জাগরূক রাখিও, জগতের পরম কল্যাণে তোমাকে মহতী আহুতি দিতে হইবে, তোমাকে

দশজনের অপেক্ষা পৃথক্ সাধনায় ব্রতী হইতে হইবে, অতএব, তোমার কর্ম্মগতির মধ্যেও বিশিষ্টতা থাকিবে। খাইতে বসিয়া চৌদ্দভুবনের খবর আলোচনা করা, ব্যক্তিগত কুৎসাদির প্রচার ও শ্রবণ করা, পরনিন্দা, পরাপবাদের প্রশ্রয় দেওয়া বর্ত্তমান ক্লীবতার একটা প্রত্যক্ষ স্বভাব হইয়াছে। তোমরা এই ক্লীবত্ব হইতে দূরে থাকিও। ক্ষুধার সঙ্গে অসত্যের যোগ করিও না, আহারের সহিত অকল্যাণের চাষ বাড়াইও না।

প্রত্যেকটী গ্রাস গ্রহণ করিবার সময়ে মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিবে,—

"এই অন্ন নিশ্চিতই অতি সহজে স্বাভাবিকভাবে পরিপাক পাইয়া সর্ব্বদোষহীন সুবিশুদ্ধ রসে পরিণত হইবে এবং তাহা হইতে সুনির্ম্মল শোণিত, শোণিত হইতে সুপুষ্ট মাংস, মাংস হইতে উৎকৃষ্ট মেদ, মেদ হইতে সুদৃঢ় অস্থি, অস্থি হইতে প্রগাঢ় মজ্জা এবং মজ্জা হইতে ঘন, পবিত্র, দিব্যগন্ধ, স্নিগ্ধ, স্বচ্ছ ও উজ্জ্বল ক্ষীরবর্ণ শুক্র উৎপন্ন হইবে। আহার্য্যোৎপন্ন প্রতিবিন্দু শুক্র আমাকে দীর্ঘায়ু, অধিকতর মেধাবী, অধিকতর উৎসাহশীল অধিকতর কর্ম্মঠ এবং অধিকতর সংযমী করুক। সংযম-শক্তির সহায়ে অধিকতর বীর্য্যরক্ষণে বলীয়ান্ হইয়া আমি অনায়াসে বিশ্ব-বিজয়ে সক্ষম হইব।"

আহারের সময়ে এই চিন্তা ব্যতীত অপর চিন্তা মনের

কাছ দিয়াও আসিতে দিবে না। রস, রক্ত, মেদ, মজ্জা প্রভৃতির বিশেষণগুলির প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিও।

আহার্য্য নিবেদন

আহার্য্য-বস্তু স্বীয় উপাস্যদেবতাকে ভক্তিভরে নিবেদন-পূর্ব্বক প্রসাদ-জ্ঞানে তাহা গ্রহণ করিবে। যে খাদ্যের উপরে ভগবানের নাম উচ্চারিত হয় নাই, তাহাকে অখাদ্য বলিয়া জানিও। মহাপুরুষ হজরত মহম্মদ বলিয়াছেন,—"যে ব্যক্তি কৃতজ্ঞতা-সহকারে ভোজন করে, সে উপবাসব্রত-(রোজা)-ধারী সংযমী লোকের তুল্য।" (হাসিদ্ তরমোজী)।

কোন্ বস্তু আহারীয়

লঘুপাক, প্রিয়, স্নিগ্ধ-গুণ-যুক্ত ধাতুপোষক, মনের প্রসন্নতা-সম্পাদক খাদ্য-সমূহই গ্রহণ করিবে। যাহা ভোজনে ব্যাধি হয় না, বরং আরোগ্য সম্পাদিত হয়, আয়ু বর্দ্ধিত হয়, যে পরিমাণ-ভোজনে শরীর সর্ব্ববিধ গ্লানি হইতে মুক্ত হয় এবং সর্ব্বপ্রকারে কার্য্যক্ষম থাকে, যাহাতে মনের সত্ত্বগুণ ও ইন্দ্রিয়-সমূহের প্রকাশ-শক্তি উপচিত হয়, তাদৃশ নির্দ্দোষ ও সুখকর দ্রব্যই সেব্য।

আহারের পরিমাণ

অন্নেন পূরয়েদর্দ্ধং তোয়েন চ তৃতীয়কম্
উদরস্য তুরীয়াংশং সংরক্ষেৎ বায়ুচালনে॥

ক্ষুধার পরিমাণকে চারিভাগ করিয়া দুইভাগ অন্নব্যঞ্জনাদি দ্বারা এবং একভাগ জল ও দুগ্ধাদি তরল পদার্থ দ্বারা পূর্ণ করিয়া অবশিষ্ট একভাগ বায়ু-সঞ্চালনের জন্য খালি রাখিবে। অর্থাৎ সর্ব্বদাই আকাঙ্ক্ষা থাকিতে ভোজন সমাপ্ত করিবে। ভোজ্য-দ্রব্য যতই রসাল ও সুস্বাদু হউক না কেন, তুমি যখন জীবন ধারণ করিবার জন্যই খাইতেছ, খাইবার জন্যই জীবন ধারণ করিতেছ না, তখন জগতের প্রতি তোমার কর্ত্তব্যগুলিকে সর্ব্বোপরি রাখিয়া আহারকে গৌণ প্রয়োজনস্বরূপ করিয়া চলিবে। খাই খাই করিয়া কপাল খাইয়া বসিও না।

নিষিদ্ধ খাদ্য, একাদশী ও পূর্ণিমা

ব্রহ্মচারীর পক্ষে কোন্ কোন্ খাদ্য শাস্ত্রানুমোদিত, তাহা যে-কোনও হিন্দু বিধবার আহার-নিয়ম লক্ষ্য করিলেই বুঝিতে পারিবে। সেই সকল বিধি-নিষেধ যথাসাধ্য মানিয়া চলাই উচিত। কিন্তু যাহাদের পক্ষে তাহা অসম্ভব, তাহাদের যার যেমন সুবিধা ও স্বাস্থ্যের অনুকূল, তাহাকে তেমন ব্যবস্থাই করিতে হইবে। তবে তাহাদিগের উচিত মনের আহারের দিকে বেশী মনোযোগ দেওয়া। মনের বল মহাবল; মনের বল সঞ্চিত হইলে, কোনও আহারই মানসিক চাঞ্চল্য আনিতে পারে না। দারিদ্র্যহেতু যাহাদের প্রায় প্রত্যহই দায়ঠেকা একাদশী করিতে হয়, তাহাদিগকে একাদশী, অমাবস্যা,

পূর্ণিমা প্রভৃতির উপবাস করিতে আমি ভূয়োভূয়ঃ নিষেধ করিতেছি। কিন্তু যাহারা, রাজার হালে না হউক, সাধারণ পুষ্টিকর খাদ্য প্রত্যহই উদরপূরণ করিয়া খাইতে পায়, তাহারা যেন একাদশী প্রভৃতিকে কুসংস্কার বলিয়া তাচ্ছিল্য না করে। সাত্ত্বিক খাদ্যাদি গ্রহণ এবং একাদশী, পূর্ণিমা প্রভৃতির উপবাস যে মানসিক সংযম-রক্ষার সহায়তা করে, তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। ঘৃত বা দুগ্ধের অভাব-প্রযুক্ত যাহারা মৎস্য-মাংস ছাড়িতে পার না, তাহারাও কখনও পেঁয়াজ, রসুন, মাদক-দ্রব্যাদি, প্রয়োজনাতিরিক্ত মরিচ প্রভৃতি কটুদ্রব্য অত্যধিক অম্ল, রুক্ষ, তীক্ষ্ণদ্রব্য ও অতিরিক্ত লবণ খাইবে না। বাসী, শুষ্ক, পচা দুর্গন্ধযুক্ত ও উচ্ছিষ্ট দ্রব্য কোনও অবস্থাতেই বিধেয় নহে।

আহারের সময়-নিষ্ঠা

প্রত্যহ ঠিক নির্দ্দিষ্ট সময়ে আহার ও জলযোগ করিবে। উপাসনা ও ব্যায়ামের ন্যায় আহারেও এই বিষয়টী লক্ষ্য করা প্রয়োজন।

——

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

স্বপাক-ভোজন

স্বপাক-আহারের চেষ্টা প্রশংসনীয়, কারণ স্বপাক-আহারে স্বাবলম্বন বর্দ্ধিত হয় এবং অশুচি-সংস্পর্শ-জনিত শতপ্রকার ব্যাধির আক্রমণ হইতে মুক্ত থাকা যায়। কিন্তু সাবধান! স্বপাক যেন বার রাজপুতের তের হাঁড়ীর ব্যবস্থা করিয়া না বসে। স্বপাক-ভোজনের একটা আধ্যাত্মিক মর্য্যাদা আছে, কিন্তু তাহার সহিত জাতিভেদের সম্বন্ধ নাই। এই কথাটা দেশবাসীর স্মৃতি হইতে ঝরিয়া পড়িয়া গিয়াছে বলিয়াই স্বপাক একটা আচার মাত্র হইয়াছে এবং ধর্ম্মান্ধ স্বপাকভোজী কামক্রোধাদি ষড়রিপু বশীকৃত না করিয়াই আধ্যাত্মিক উন্নতির গৌরব করিয়া মরিতেছে। স্বপাক-ভোজনের যথার্থ তাৎপর্য্য জানা থাকিলে তথাকথিত স্বপাক-ভোজীরা জানিয়া শুনিয়াও পরম পরিতৃপ্তির সহিত গো-শূকর সর্পাদির চর্ব্বিমিশ্রিত ঘৃত, পালোমিশ্রিত দুগ্ধ ও জিলেটিন মিশ্রিত মধু সেবন করিতে পারিত না।

মনুষ্যজন্মের দুর্ল্লভতা

অনেক যোনি পরিভ্রমণ করিয়া এই যে দুর্ল্লভ মানবজন্ম লাভ করিয়াছি, হাসিয়া খেলিয়া, খেয়ালে হুজুগে, ভোগ-বিলাসে কাটাইয়া দিবার মত তুচ্ছ নগণ্য জিনিষ ইহা নহে। আবার, জীবন ক্ষণ-ভঙ্গুর, এই আছে, এই নাই, কখন যে ইহার চিরাবসান ঘটিবে, কখন যে এই মিটি-মিটি প্রদীপের

আলোটী জোর বাতাসের ঝাপ্‌টা লাগিয়া নিভিয়া যাইবে, কে জানে ? দুর্ল্লভ বলিয়াই এই মনুষ্যজন্মের মধ্যেই শ্রীভগবানকে লাভ করিতে হইবে, আবার ক্ষণস্থায়ী বলিয়া এখনই তাঁহাকে ডাকিবার মত ডাকিতে হইবে। আমার সর্ব্বেন্দ্রিয় যে তাঁর পরশের জন্য আকুল হইয়া উঠিয়াছে, চক্ষু তাঁর রূপ দেখিতে চায়, শ্রবণ তাঁর মধুকথা শুনিতে চায়, নাসিকা তাঁর কমলাঙ্গের পদ্মগন্ধ পাইতে চায়, জিহ্বা তাঁর সকল মধুরতার আস্বাদন পাইতে চায়, সর্ব্বাঙ্গ তাঁর সর্ব্বাঙ্গের স্পর্শ পাইতে চায়, মন একমাত্র তাঁতেই রমণ করতে চায়। জীবন ত' ক্ষণভঙ্গুর, তাই আমি এখনই তাঁকে চাই, আমার সবুর সহে না, মন ধৈর্য্য মানে না, বিশ্রামের অবসর নাই, বিলাসের সামর্থ্য নাই। আমার আপনার-জনকে সর্ব্বথা পাইবার জন্য মন ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে, ভোগার্থীর ডাক সে শুনিতে চাহে না, মোহার্থীর আহ্বানে সে বিচলিত হইতে ভালবাসে না। এখনই ত' তাঁকে চাই ! কিন্তু কোথায় পাই ? কে বলিয়া দিবে কোথায় পাইব, কেমনে পাইব ?

দুর্ল্লভ মানুষের দুর্ল্লভ আকুলতা যেদিন ফুকারিয়া কাঁদিয়া একথা জিজ্ঞাসিল, সেইদিন বেদ-ব্রহ্ম অন্তরমাঝে জাগিয়া উঠিলেন,—উজ্জ্বল-আলোক-সম্পাতে অন্ধকারে পথ দেখাইলেন, হতাশার হাহাকারের মধ্যে ভরসারাশি স্থল-কমলের মত দশদিকে হাসিয়া উঠিল। সাধক জানিলেন,—জীবনের প্রতি

নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসই শ্রীভগবানের শ্রীঅঙ্গের পরশ, আমার চেষ্টা, আমার উদ্যোগ, আমার আয়োজন, আমার প্রয়োজন, আমার বিষাদ, আমার বেদনা, আমার উল্লাস, আমার আনন্দ, সকলেরই ভিতর যে ঐ একমাত্র বাঞ্ছিত-ধনেরই স্নেহকোমল পেলব পরশ রে ?

আহার মানে শ্রীভগবানের সেবা

সেদিন হইতে সাধক জানিলেন, আমার আহার ত' প্রকৃত প্রস্তাবে আমারই আহার নয় ! এ যে শ্রীভগবানের শ্রীঅঙ্গেরই সেবা, তাঁরই ত' প্রীত্যর্থে আমার এই দ্রব্যসম্ভার, তাঁরই ত' প্রীত্যর্থে উৎসর্গীকৃত আমার এই জীবন যৌবন ! আমার এ দেহ ভাঙ্গিলে দুঃখ নাই, মন ধ্বংস হইলে আক্ষেপের কিছু নাই, এই দেহ-মন তাঁরই প্রিয় কার্য্যসাধনে সমর্পণ করিয়া আমি ধন্য হইতেও ধন্যতর হইয়াছি। এ দেহ রাখিলে তাঁরই জন্য রাখিব, এ দেহ ত্যজিলে তাঁরই জন্য ত্যজিব। এই যে আমার দেহপুষ্টির প্রয়াস, এই যে আমার আহার-প্রচেষ্টা সবই মুখ্যতঃ তাঁরই সেবার জন্য,—আমার জন্য নয়, আমার সুখ, আমার ভোগ, আমার প্রীতির জন্য নয়, কিছুতেই নয়, কখনই নয়। তাঁর প্রীতিতে আমাতে যে প্রীতি স্বতঃসঞ্জাত হইবে, আমি তারও লুব্ধ নহি, আমি চাই তাঁরই প্রীতি, তাঁরই তৃপ্তি ; তাঁর তৃপ্তিতেই আমার চরিতার্থতা, আমি আর কিছু চাই না।

স্বপাক-ভোজনের আধ্যাত্মিক তাৎপর্য্য

কিন্তু ভগবানের পূজার ভার কোন্ ভক্ত মাহিনা-করা

পূজারীর হাতে দিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে? প্রিয়তমের পদ-সেবার ভার কোন্ সাধ্বী নারী দাসীর হস্তে ন্যস্ত করিয়া রহিতে পারে? তাই, ভক্ত স্বপাক ধরিলেন, বাৎসল্য ভাবের ভক্ত নিজ অন্তরস্থ আদরের গোপালকে স্বহস্তে রাঁধিয়া খাওয়াইলেন, মাধুর্য্য ভাবের ভক্ত নিজ হাতে হৃদ্-বৃন্দাবন-চারী শ্রীনন্দ-নন্দনের পদ-সেবা করিলেন।

ইহাই হইল তাৎপর্য্য। তারই জন্য খাদ্যদ্রব্যও তোমাকে পবিত্র ভাবে আহরণ, রন্ধন ও পরিবেশন করিতে হইবে; হৃষ্ট-চিত্তে সংযত-বাক্ হইয়া প্রাণ-দেবতার প্রসাদ জ্ঞানে শ্রদ্ধিত হৃদয়ে সন্তোষের সহিত ইহা গ্রহণ করিতে হইবে। আহার রসনা-পরিতৃপ্তি মাত্র নহে, ইহা প্রথমতঃ দেব-সেবা এবং দ্বিতীয়তঃ দেবতার প্রসাদ গ্রহণ।

স্বপাক-ভোজনের উপকারিতা

এই ত' গেল আধ্যাত্মিক তাৎপর্য্যের কথা। এ ছাড়া স্বপাকে আরো অনেক লাভের কথা আছে। স্বপাকে স্বাস্থ্য উন্নত হয়, যেহেতু পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা রক্ষিত হয়, অন্যের ক্ষয়কাস, টাইফয়েড্, আমাশয় প্রভৃতি রোগ-বীজাণু খাদ্যে সংমিশ্রিত হইয়া উহা দূষিত করিতে পারে না এবং খাদ্যে অতিমাত্রায় ভেজাল চলে না।

সবচেয়ে বড় লাভের কথা, স্বপাকে স্বাবলম্বন শিক্ষা হয়, সংযম অভ্যস্ত হয় এবং ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য বজায় থাকে।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

অন্নের শুদ্ধতা

অসাধু উপায়ে আহৃত অন্ন ভোজনে সাধুর মধ্যে অসাধুর ভাব সংক্রামিত হয়, সুতরাং সামর্থ্য-পক্ষে অপরের অন্ন গ্রহণ করিবে না। কোন্ ব্যক্তি কি ভাবে অর্থ সংস্থান করিয়াছে, তাহা তুমি জানো? পাপের দ্বারা, অন্যায়ের দ্বারা বা নীতি-ধর্ম্ম-বিগর্হিত উপায়ের দ্বারা সঞ্চিত অর্থে যে সকল দ্রব্য ক্রীত হয়, তাহারাও পাপ-স্বরূপ জানিবে। নিজে পাপ না করিলেও পাপানুষ্ঠান-লব্ধ অর্থ দ্বারা নিজের দেহের পুষ্টিতে সম্মত থাকিলে, প্রকৃত প্রস্তাবে পাপে সম্মতিই প্রকাশ পায়।

আমরা যাহাতে অবিরত অকৈতব প্রযত্নে একমাত্র সত্য-স্বরূপেরই উপাসনা করিতে পারি, ইহাই যেন আমাদের নিত্য-কালের প্রয়াস থাকে। সকল ফন্দী চাতুরীর অতীতে রহিয়া সকল ছল-কাপট্য-প্রবঞ্চনার-বাহিরে থাকিয়া সর্ব্বতোভাবে পুণ্য প্রতিভায় সমুজ্জ্বল, সুন্দর, সত্য মুর্ত্তিতে যেন আমরা নিজ মহিমায় প্রতিষ্ঠিত থাকি। জীবনের কোনও আকাঙ্ক্ষায় বা আচরণে যেন গিল্টি করা সোণা আসিয়া আসল সোণার স্থান অধিকার না করে। তাই, আমাদিগকে সর্ব্বদা সাবধান থাকিতে হইবে যেন, আতিথ্য, নিমন্ত্রণ-গ্রহণ বা বন্ধুত্ব-রক্ষার মধ্য দিয়া পাপ-প্রবৃত্তির সূক্ষ্ম প্ররোচনা গ্রহণ করিয়া না বসি।

মূল্যের দ্বারা দ্রব্য বিশুদ্ধ হয়। তুমি যদি তোমার ধর্ম্মানুমোদিত পরিশ্রমের মূল্য-স্বরূপে পাপী ব্যক্তির নিকট হইতেও অন্ন বা অর্থ গ্রহণ কর, তাহাতে তোমাতে কোনও দোষ-স্পর্শ হয় না। কারণ, পাপী ব্যক্তি যেমন ভাবেই অর্থ গ্রহণ করিয়া থাকুক, তুমি তাহার অনুজীবী হইয়া তাহার পাপে পরোক্ষ সম্মতি দিতেছ না। তাহা দ্বারা যদি কোনও ধর্ম্মসঙ্গত কার্য্যের অনুষ্ঠান হয়, তবে তাহার জন্য পরিশ্রম করিয়া বিনিময়ে অন্ন বা অর্থ গ্রহণ করিলে তোমার পরিশ্রমের মূল্যেই তাহা বিশুদ্ধ হইয়া যাইবে। যতক্ষণ ঐ অর্থ তাহার ছিল, ততক্ষণ উহা পাপপূর্ণ ছিল, কিন্তু যেই সে অধর্ম্মবিহীন পরিশ্রম-রূপ মূল্য গ্রহণ করিয়া তাহা তোমাকে দিল, অমনি তাহা পাপ-মুক্ত হইল এবং তাহার পাপ তাহাকেই আশ্রয় করিয়া রহিল। কারণ, সে তোমাকে অর্থই বিক্রয় করিয়াছে, পাপ বিক্রয় করে নাই।

অভিক্ষা ব্রত

সত্য-সাধনে অগ্রসর হইয়া প্রথম পাদক্ষেপের সাথেই বুঝিতে পারিবে, অভিক্ষা-ব্রত গ্রহণ ব্যতীত সিদ্ধিলাভ অসম্ভব। সকলের সাহায্য-নিরপেক্ষ হইয়া, ভিক্ষাবৃত্তি-পরাঙ্মুখ হইয়া সম্যগ্‌রূপে আত্মাবলম্বী না হইলে পরোক্ষ অসত্যে সমগ্র প্রত্যক্ষ জীবন আচ্ছন্ন হইয়া পড়িবে এবং পরিশেষে ধোকায় বোকা সাজিয়া হা-হুতাশ করিতে হইবে। তাই, আমাদিগকে

কাছা-ঢিলা প্রযত্ন ছাড়িয়া নৈষ্ঠিক সাধনায় ব্রতী হইতে হইবে। জীবন হইতে অসত্যকে পরিবর্জ্জন করিয়া সর্ব্বতোভাবে শুদ্ধ-সত্ত্ব এবং অপাপবিদ্ধ থাকিতে আপ্রাণ আয়াস স্বীকার করিতে হইবে। ক্ষুধাখিন্ন দেহকে অসত্যোপার্জ্জিত অথবা অন্য-প্রদত্ত আহার্য্যে বাঁচাইয়া রাখিবার ক্ষীণতম প্রলোভনটুকুকে অভিক্ষা-ব্রত রূপ হিমাচলের প্রচণ্ড চাপে একেবারে পিষিয়া মারিয়া ফেলিতে হইবে।

জিজ্ঞাসা করিবে, তবে কি বিদেশ-বিভূয়ে গিয়া কি না খাইয়া মরিব? আমার উত্তর একেবারে সোজা। মরাই উচিত এবং মরিতে মরিতেই তোমরা বাঁচিতে শিখিবে। পাড়া-প্রতিবাসী হইতে আরম্ভ করিয়া দেশ-বিদেশের লোকের কাছে তোমরা ভিক্ষাবৃত্তির জ্বলন্ত প্রতিমূর্ত্তি-স্বরূপ দাঁড়াইয়াছ। তোমাদের চেহারা দেখিলে লোকে মুখের কথা না শুনিয়াও তোমাদিগকে ভিক্ষুক বলিয়া অনায়াসে বুঝিয়া লয়। তোমাদের এই জাতিগত ভিক্ষা-বৃত্তি দেহে, মনে, সর্ব্বতঃ সংক্রমণে তোমা-দিগকে পশুর অধম করিয়া রাখিয়াছে। তোমরা পরপদ-লেহনের অপেক্ষা বড় ধর্ম্ম জান না, পর-পরিতোষণের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কর্ম্ম শিখ না, অহঙ্কৃত দাম্ভিকের, মিথ্যা আভিজাত্য-গর্ব্বীর, কাঞ্চন-কৌলীন্য-স্পর্দ্ধিতের ধামা ধরা পরমপুরুষার্থ জানিয়া নিত্য নিত্য পুরুষত্ব হারাইয়া হীন, ক্লীব হইতেছ।

তোমাদের অভ্যুত্থান-মন্ত্র ঐ "অভিক্ষা"। যাহারা আত্ম-সম্মান শিখিল না বলিয়াই সকল অসম্মানের আস্পদ হইয়াছে, আত্মস্থ হইতে ভাল বাসিল না বলিয়াই সকল অস্বাস্থ্য-অবসাদে পীড়িত হইতেছে, আপন মহিমার অনুসন্ধান লইল না বলিয়াই বিদেশাগতা চাক্‌চিক্য-শালিনী মোহময়ী সভ্যতায় মদির-নেত্র হইয়াছে, ঘরের ঠাকুর ফেলিয়া যাহারা পরের কুকুর কোলে লইয়া দুঃখ-দুর্গতির চরমে পৌছিয়াছে, তাহাদের জন্য জানিও এই "অভিক্ষাই" একমাত্র কল্যাণপন্থা। অভিক্ষা ভীরুকে ভুবনজয়ী করিবে, কাপুরুষকে অসম-সাহসী করিবে, আত্ম-বিস্মৃতকে উচ্চাকাঙ্ক্ষ করিবে, সঙ্কীর্ণতার কারাগারে অবরুদ্ধ আত্মাকে আকাশের ন্যায় উদার উন্মুক্ত করিবে।

ব্যক্তিগত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আচরণে যেমন, জাতিগত সুমহৎ আন্দোলনে তেমন. অভিক্ষাই সর্ব্বাপেক্ষা কার্য্যকরী এবং সামর্থ্যবর্দ্ধক। ইহা যেমন পৌরুষের ব্যঞ্জনা করে. তেমন পৌরুষের বর্দ্ধনও করে; ইহা যেমন মনুষ্যত্ব প্রমাণিত করে, তেমন মনুষ্যত্বের উপচয়ও সাধন করে। যে চাবি হারাইয়া বুদ্ধিভ্রষ্ট শতকোটি মানবসন্তান পাগ্‌লা গারদের দরজা খুলিতে পারিতেছে না, অভিক্ষাই সেই চাবি।

আহার্য্য-পানীয় গ্রহণের বিনিময়

তাই, তোমাদের প্রতি আমার এই দৃঢ় অনুশাসন রহিল, কাহারও নিকটে কখনও অনুগ্রহ প্রার্থনা করিবে না, কোনও

ক্রমেই কাহারও নিকটে ঋণী রহিতে সম্মত হইবে না, বিনা প্রতিদানে কাহারও নিকট হইতে কোনও বস্তুর আকাঙ্ক্ষাও করিবে না, গ্রহণ করা ত' দূরেরই কথা। জগৎ-কল্যাণমূলক বিশেষ প্রয়োজন না পড়িলে কাহারও অন্ন-গ্রহণ করিবে না এবং যখনই কাহারও অন্নগ্রহণ প্রয়োজন পড়িবে, তখন হইতে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে তাহার নানাবিধ উপকার করিতে চেষ্টিত থাকিবে। যে ব্যক্তি এ জীবনে তোমাকে এক পাত্র পানীয় জল দিয়াছে, মরণকাল পর্য্যন্ত তাহার হিত-চিন্তা করিতে বিস্মৃত হইবে না।

"তোর কি মনে থাকে না,
জগৎ মাঝে সবার কাছে
আছেরে কত দেনা?
—শ্রীশ্রীস্বরূপানন্দ—

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

আহার-কালে জলপান

আহার-কালে বারংবার অল্প অল্প মাত্রায় জল পান করিবে। আহার সময়ে অধিক জল পান করিলে অথবা আদৌ না করিলে ভুক্ত দ্রব্য পরিপাকে বাধা জন্মে। অতি প্রত্যূষে এবং রাত্রিতে শয়নের পূর্ব্বে জল-পানে দেহ-মনের সাম্যভাব সংস্থাপিত হয় এবং সত্ত্বগুণ বর্দ্ধিত হয়। যে জল পিচ্ছিল, অস্বচ্ছ, শৈবাল-কর্দ্দমাদি দ্বারা ক্লিন্ন, বিরস এবং সূর্য্য ও চন্দ্র-কিরণ দ্বারা অসংস্পৃষ্ট, তাহা স্নানে ও পানে ব্যবহার্য্য নহে। যে জল গন্ধহীন, অব্যক্ত-রসান্বিত, নির্ম্মল, স্বচ্ছ ও হৃদয়গ্রাহী, তাহাই ব্যবহার করিবে। দূষিত জল পোড়া লোহা ডুবাইয়া, অগ্নিতে সিদ্ধ করিয়া, রৌদ্র-সন্তপ্ত করিয়া, ফিট্‌কিরি কর্পূর প্রভৃতি মিশ্রিত করিয়া অথবা বালি, অঙ্গার প্রভৃতির দ্বারা ফিল্টার করিয়া, যে অবস্থায় যেরূপ উপায় অবলম্বন স্বাস্থ্যকর, তাহাই করিয়া সুবিশুদ্ধ করিয়া লইবে।

দুগ্ধপান

প্রত্যহই কিছু দুগ্ধ পান করিবার চেষ্টা করিবে। দুগ্ধজাত কোনও না কোনও দ্রব্য সেবন শরীরের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন। যাহারা কিছুতেই দুগ্ধ বা দুগ্ধজাত দ্রব্যের সংস্থান

করিতে পারে না, তাহাদের পক্ষে বিবেকের বা ধর্ম্ম-সংস্কারের বাধা না থাকিলে পরিমিতভাবে সহজ-সংস্থেয় মৎস্য বা মাংস সেবন সম্বন্ধে সুচিকিৎসকের উপদেশানুযায়ী চলা সঙ্গত। কিন্তু দুগ্ধ ও ঘৃত অপেক্ষা মৎস্য মাংস অনেক হীন-গুণ। কৃষ্ণবর্ণা গাভীর দুগ্ধই গুণাংশে শ্রেষ্ঠ। যে গাভী বা ছাগী বিষ্ঠাদি ভক্ষণ করে অথবা যাহার যক্ষ্মাদি কঠিন ব্যাধি আছে, আহার্য্যাভাবে যে গাভী জীর্ণা শীর্ণা, যাহার দুগ্ধ স্বীয় শাবকের ক্ষুন্নিবৃত্তির অতিরিক্ত নহে, তাহার দুগ্ধ অখাদ্য। যে দুগ্ধ বিবর্ণ, বিরস, অম্লাস্বাদ, যাহা দুর্গন্ধযুক্ত বা জমাট-বাঁধা এবং যাহার সহিত লবণ-সংযোগ ঘটিয়াছে, তাহা সেবনে কুষ্ঠব্যাধি হয়। ক্ষীণাগ্নি বা নিষ্ঠাবান্ ব্যক্তি দুগ্ধের সহিত কখনও মুড়ি খাইবে না, কারণ মুড়ি ভাজিতে লবণ সংযোগ হয়।

দুগ্ধ সর্ব্বাবস্থায়, সর্ব্ব বয়সে এবং সর্ব্ব সময়েই শরীরের পক্ষে পরম কল্যাণকর। বাল্যে সেবনে ইহা শরীরের বৃদ্ধি করে, ক্ষয়ের অবস্থায় সেবনে ইহা ক্ষয় নিবারণ করে, বার্দ্ধক্যে সেবনে শুক্রবৃদ্ধি করে। প্রাতে সেবনে বীর্য্য-বৃদ্ধি, দেহ-পুষ্টি ও অগ্নির দীপ্তি সাধন করে; মধ্যাহ্নে সেবনে বলবৃদ্ধি, কফনাশ, পিত্ত-নিবারণ ও অগ্নি-দীপন করে এবং রাত্রিতে সেবনে বহু দোষ নাশ ও চক্ষুর উপকার করে। দিবাভাগে যে সমস্ত অন্ন-পানীয় গ্রহণ করা হয়, সেই সমস্ত ভুক্ত বস্তু-জনিত বিদাহ শান্তির নিমিত্ত প্রত্যহ রাত্রিকালে দুগ্ধপান অনেকের পক্ষে বিশেষ

প্রয়োজন। কিন্তু রাত্রিকালে দুগ্ধপান করিয়া কেহ কেহ অসুবিধাগ্রস্তও হয়, সুতরাং এই বিষয়ে ব্যক্তিগত সামর্থ্য বুঝিয়া চলিবে।

দধি-ভোজন

রাত্রিতে দধি-ভোজন করিবে না। যদিই বা কর, তাহা হইলে উহার সহিত জল, ঘৃত, চিনি, মুগের যূষ, মধু, মরিচ বা আমলকী মিশ্রিত করিয়া লইবে। হেমন্ত, শীত ও বর্ষাকালে দধিভোজন প্রশস্ত; শরৎ, গ্রীষ্ম ও বসন্তে অস্বাস্থ্যকর। দুগ্ধে গুড় মিশ্রিত করিলে তাহা পিত্ত-শ্লেষ্মকর হয়, কিন্তু দধি গুড়-সংমিশ্রিত হইলেই সমধিক উপকারী হইয়া থাকে। টাটকা দধি দীর্ঘায়ুবর্দ্ধক খাদ্য সমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

আহারান্তে হস্তলেহন

আহারান্তে জিহ্বা দ্বারা হস্তলেহনের অশেষ প্রশংসা হজরত মহম্মদ করিয়াছেন। আমারও উহার প্রশংসা করিতে ইচ্ছা করে। আরব দেশীয় ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক আরবের অর্থনৈতিক অবস্থার দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই হস্তলেহনের নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন, মনে হয়। কিন্তু আমার প্রশংসার কারণ অন্যরূপ। প্রত্যহ আহারের পরে হস্তলেহন করিলে, ইহাতে জিহ্বার নিয়মিত ব্যায়াম হয় বলিয়া জিহ্বা দৃঢ় এবং জড়তা-বিহীন হয়। বিশেষ লাভ এই যে, জিহ্বা ক্রমেই দৃঢ়তর হইতে থাকে

এবং তাহাতে ইন্দ্রিয়-সংযমের বিশেষ সহায়তা অজ্ঞাতসারেই হইয়া থাকে। আর যদি জিহ্বাঘটিত যোগশাস্ত্রানুমোদিত কৌশল সমূহের অভ্যাস করা যায়, তবে ত' কথাই নাই।

আহারকালীন শ্বাস-প্রশ্বাস

পিঙ্গলা নাড়ীতে অর্থাৎ দক্ষিণ নাসারন্ধ্রে শ্বাস বহনকালে ভোজন বা জলযোগ করিবে। আহারের সময়ে ঈড়ার অর্থাৎ বাম নাসারন্ধ্রে শ্বাসবায়ু থাকিলে বাম কুক্ষি বাম হাঁটু দ্বারা চাপিয়া রাখিয়া উপবেশন করিলে অথবা বাম পার্শ্বে শয়ন করিলেই শ্বাস পরিবর্ত্তিত হইয়া দক্ষিণ নাসারন্ধ্রে বহিতে থাকিবে। কিছুকাল ব্রহ্মচর্য্য সাধনের দ্বারা ধৃতবীর্য্য হইলে এবং মনঃসংযম সাধনের দ্বারা যতচিত্ত হইলে ইচ্ছামাত্র অনায়াসে বাহ্যপ্রক্রিয়া ব্যতীত একমাত্র মনের শক্তিতেই শ্বাসবায়ু পরিবর্ত্তিত হইতে পারে। সঙ্কেতটুকু আর কিছুই নহে,—যে নাসায় শ্বাস বহাইতে হইবে, সেই নাসায় নিজমূর্ত্তি চিন্তা করতঃ ইষ্টমন্ত্র জপ করিতে হয়।

জলপান ও মূত্রত্যাগকালে শ্বাস-প্রশ্বাস

মলত্যাগ কালেও দক্ষিণ নাসাপুটে এবং জলপান ও প্রস্রাব-ত্যাগ কালে বাম নাসাপুটে শ্বাস বহন করিবে। কিন্তু মলত্যাগের সময়ে যে প্রস্রাব ত্যাগ করিতে হয়, অথবা

আহারের সময়ে যে জলপান করা হয়, তাহাতে এই নিয়ম অনুসরণ করিবার আবশ্যকতা নাই। সে স্থলে শ্বাস-প্রশ্বাস,—আহার ও মলত্যাগের নিয়মাধীন হইবে।

উপাসনাকালীন শ্বাস-প্রশ্বাস

উভয় নাসায় শ্বাস বহিবার সময়ই উপাসনার শ্রেষ্ঠ সময়, আবার উপাসনায় চিত্ত স্থির হইলে আপনিই উভয় নাসায় শ্বাস বহিতে থাকে। উপাসনা-কালে নাম জপ করিতে শ্বাসে প্রশ্বাসে জপিবে; সেই শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক হইবে; তাহার উপরে বলপ্রয়োগ করিয়া হ্রস্ব বা দীর্ঘ করিবে না।

এইগুলিকে ধর্ম্মান্ধজনোচিত কুসংস্কার মনে করিয়া পালনে শৈথিল্য করিও না। পাশ্চাত্য মনীষীর মনীষা এখন পর্য্যন্ত প্রাণ-তত্ত্বের ধার কাছ দিয়াও যাইতে পারে নাই। গভীর শ্বাস-বহনে দেহের কল্যাণ সাধন হইয়া থাকে, তাঁহারা এই পর্য্যন্তই অবগত আছেন, অতিরিক্ত কিছু জানেন না। আর শ্বাস-প্রশ্বাসের সহিত আধ্যাত্মিক সাধনের এবং বিশ্বজনীন কল্যাণ-প্রয়াসের কোন্ অজ্ঞাত সূক্ষ্ম সম্বন্ধ রহিয়াছে, অণুবীক্ষণ যন্ত্রে এখন পর্য্যন্ত তাহা ধরা পড়ে নাই এবং খুব শীঘ্রই যে ধরা পড়িবে, এমন সূচনাও কিছুমাত্র লক্ষিত হইতেছে না। স্থূলেন্দ্রিয়ের বাহিরে এক সূক্ষ্ম সাধনার ক্রম প্রাচীন ভারতীয় ঋষিগণ আবিষ্কার করিয়াছিলেন, যাহার

নির্ভুলতা এবং অকাট্যতা একমাত্র সাধনার কষ্টিপাথরেই প্রমাণিত হয়, যুক্তি-বিচারে কুলায় না। সেই সূক্ষ্ম নিয়মতত্ত্বের কিছু কিছু বাহ্য অভ্যাস-মাত্র এই শ্বাসপ্রশ্বাসের নিয়মাবলিতে ধরা পড়ে। এইগুলিকে উপেক্ষা করিবার কিছু নাই।

শ্বাস-প্রশ্বাসে দেহ-লক্ষণের ইঙ্গিত

এই প্রসঙ্গে আর একটা দরকারী কথা বলিয়া রাখি। অধিকক্ষণ দক্ষিণ নাকে শ্বাস থাকিলে, জানিবে, স্নান, চক্ষুঃ-প্রক্ষালন, মস্তকধাবন, শীতল খাদ্যপানীয় গ্রহণ প্রভৃতি দ্বারা শরীর স্নিগ্ধ রাখার চেষ্টা করা প্রয়োজন। অধিকক্ষণ বাম নাসায় শ্বাস থাকিলে বুঝিবে, কিছুক্ষণ গরমে থাকা দরকার। অধিক বিস্তারের মধ্যে না যাইয়া শুধু এই দুইটী সঙ্কেতের উপর নির্ভর করিয়া চলিতে পারিলে প্রায় সর্ব্ববিধ ব্যাধির প্রতিষেধ করা সম্ভব হয়।

মুখশুদ্ধি

আহারান্তে পরিষ্কার জল দ্বারা মুখ অতি উত্তমরূপে প্রক্ষালন করিবে। তৎপর হরীতকী, আমলকী, ধনে প্রভৃতির দ্বারা মুখ-শুদ্ধি করিবে। তাম্বূল সেবন করিবে না, উহা আংশিক কাম-বর্দ্ধক। মৌরী এবং যোয়ান (যমানী) আংশিক শুক্র-ক্ষয়কারক, সুতরাং উদরের পীড়া না থাকিলে সাধারণতঃ ইহা দ্বারা মুখশুদ্ধি করিবে না।

আহারান্তে

আহারের পর অন্ততঃ অর্দ্ধঘণ্টা বিশ্রাম করিবে। পায়ের পাতা পশ্চাতে মুড়িয়া তাহার উপরে কিছুকাল উপবেশন করিয়া থাকা হিতকর। আহারান্তিক শ্রম ও অবসাদ সম্পূর্ণ-রূপে দূরীভূত না হওয়া পর্য্যন্ত কিছুতেই কোনও দৈহিক বা মানসিক শ্রম করিবে না। ইংরেজীয়ানা শিক্ষার গুণে এখন তোমাদের আহারের অব্যবহিত পরেই হাঁপাইতে হাঁপাইতে স্কুলের দিকে না দৌড়াইলে আর চলে না। সুতরাং আহারাদি একটু সকাল সকাল সমাপন করিতে প্রয়াস পাইবে। অথবা যদি ইংরেজীয়ানা শিক্ষার মোহের নিগড় ভাঙ্গিতে পার, কিম্বা কোন জগৎকল্যাণ-কারী মহাজনের চেষ্টায় গ্রামে গ্রামে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয়, তবেই এইজাতিবিধ্বংসী দুর্গতিমূলক কুপ্রথার উচ্ছেদ-সাধান সম্ভব।

———

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

ব্রহ্মচর্য্য-মূলক প্রতিষ্ঠানের অবশ্যম্ভাবিত্ব

আজ যদি উপযুক্ত ভাবে পরিচালিত উপযুক্ত-সংখ্যক ব্রহ্মচর্য্য-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিতে পারিতাম, তাহা হইলে এই মুহূর্ত্তে ইংরেজীয়ানা স্কুল-কলেজগুলির ভিত্তিমূল উৎখাত করিয়া দিয়া, যাহা ভারতের নিজস্ব মানবতার উন্মেষ সাধন করে, যাহাতে পরানুগ্রহলোলুপ পশুভাবাপন্ন মনুষ্য-নামের কলঙ্ক-স্বরূপ ভারতবাসী নিজের পূর্ব্বতন যাবতীয় কলুষ-কালিমার ক্ষালন করিয়া শুদ্ধ শুভ্র সুন্দর হইতে পারে, তেমন পৌরুষ-প্রসারিণী, শৌর্য্য-বীর্য্যশালিনী, মনুষ্যত্ব-মহিম-মালিনী, পূর্ণতার ধাত্রীস্বরূপিণী সুশিক্ষার সুব্যবস্থা করিতাম। কিন্তু দেশ জাগিয়াছে বলিয়া ভেরীনিনাদ হইলেও দেশবাসীর প্রাণে যথার্থই জাগরণ আসে নাই। এক একটা আন্দোলনে দেশবাসী এক একবার তন্দ্রাঘোর ছাড়িয়া চক্ষু রগ্‌ড়াইতে রগ্‌ড়াইতে উঠিয়া বসিতেছে এবং ক্ষণেক পরেই পুনরায় মোহশয্যায় ঢলিয়া পড়িতেছে। তাই আজই দেশব্যাপী ব্রহ্মচর্য্য-শিক্ষার উপযোগী বিদ্যালয়-সমূহ-গঠনের চেষ্টা সম্পূর্ণরূপে সফল হইতে পারিতেছে না। কিন্তু যদি আমাদের একনিষ্ঠা থাকে এবং জগতের কল্যাণের কাছে আত্মকল্যাণকে নিঃসঙ্কোচে বলি দিবার মনোবল থাকে, তবে নিঃসহায়ই হই, আর নিঃসম্বলই হই, দিনের পর দিন আমরা সাফল্যের দিকে অগ্রসর হইতে থাকিব। অবশ্য এ পুণ্যপ্রচেষ্টায় আমরা শত

শত প্রকারের বাধা-বিঘ্ন দ্বারা আক্রান্ত হইব, কিন্তু দেশকে যদি ভালবাসিয়া থাকি, তাহা হইলে শেষ পর্য্যন্ত সমরজয়ী হইবই ; যদি চিত্তহীন না হই, তাহা হইলে বিত্তহীন বলিয়াই পরাজিত হইব না। সাফল্য কখনও মেরুদণ্ডহীন বাগ্‌বিভূতির অনুসরণ করে না, শক্ত হাতের শক্ত কাজে একেবারে নিভৃত নীরবতার মধ্য দিয়াই সাফল্য আসে। আর, প্রকৃতই যেদিন আমরা, দেশ যে প্রতিষ্ঠান অন্তরে অন্তরে কামনা করে, তাহাই গড়িতে পারিব, সেদিন একটী নিমিষের মধ্যে বৈদেশিক শিক্ষার মন্দির-চূড়াগুলি ভূকম্প-তাড়িতের ন্যায় আপনি খসিয়া পড়িবে, অথবা, পাশ্চাত্য শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলির সহিত তুল্যকক্ষ প্রতিযোগিতায় সগৌরবে ব্রহ্মচর্য্য-মূলক প্রতিষ্ঠানগুলি স্বকীয় কার্য্য-পরিচালনা করিয়া দেশ ও জাতির সেবা করিবে।

এতদ্দেশ-প্রচলিত পাশ্চাত্য শিক্ষার অসম্পূর্ণতা

পাশ্চাত্য শিক্ষা-পদ্ধতির যথেষ্ট গুণ আছে, স্বীকার করি কিন্তু পাশ্চাত্যের যে সাধনা তাহাকে মনুষ্যত্বের একটা আভাষ দান করিয়াছে, এতদ্দেশ-প্রচলিত শিক্ষায় তাহার কণামাত্র প্রতিফলিত হইতেছে না। বরঞ্চ সভ্যতার নামে পাশ্চাত্যেরা যে সব পিশাচ-তাণ্ডব বা দানবী-লীলার অনুষ্ঠান করিয়াছেন এবং করিতেছেন, মোহমুগ্ধ নেত্রে আমরা তাহাকেই নিশানুগ সূর্য্যোদয় ভাবিয়া তাহার পানে চাহিয়া আছি, পাশ্চাত্যের কলুষ-কালিমা মাখিয়া আমরা পাশ্চাত্য সাধনার গৌরব

করিতেছি। শুধু আমাদেরই যে এ দুর্গতি তাহা নহে, এমন কি পাশ্চাত্য-দেশবাসীরা স্বয়ং সর্ব্বজনীনভাবে তাহাদের যথার্থ সাধনার পরিচয় রাখেন না। অমানিশার বিদ্যুচ্ছটার মত এক একজন মহর্ষি আসিয়া পাশ্চাত্যকে তাঁহার সভ্যতার স্বরূপ ও বিরূপতা দেখাইয়া দিয়া তাঁহার সাধনার মর্ম্মকথা বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু ব্যাপকভাবে তাহা উপলব্ধই হয় নাই। শারীর শক্তির চর্চ্চা করিয়া পাশ্চাত্যেরা বক্ষের প্রসার বাড়াইয়াছেন, মাংসপেশী দৃঢ় করিয়াছেন কিন্তু বক্ষঃপঞ্জরের অন্তরালে যে কোমল হৃদয়টী বিশ্ব-মানবের জন্য অনুভব করে, মাথার খুলির মধ্যে যে মস্তিকটী সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম আত্ম-তত্ত্বের প্রত্যক্ষ উপলব্ধি লাভ করে, তাহার গঠন পাশ্চাত্যের তেমন ভাবে হয় নাই। যদি হইত, তাহা হইলে পাশ্চাত্য-জাতিরা রাক্ষসী ক্ষুধায় অধীর হইয়া পররাষ্ট্র পদানত করিতে চাহিতেন না, নিঃসহায় নর নারীর উপর বর্ব্বরোচিত অকথ্য অত্যাচার করিতেন না, রুগ্ন, শিশু ও বার্দ্ধক্য-পীড়িতের দেহে অস্ত্রাঘাত করিতে পারিতেন না, বোমা, বন্দুক, কামান, ডিনামাইটে আজ হত্যার স্রোত বহাইতেন না। হীন স্বার্থের বশীভূত হইয়া পাশ্চাত্য সভ্যতার গর্ব্বকারীরা জাতিগত ভাবে যেরূপ অন্যায় অবিচারের অনুষ্ঠান করিয়াছে, তাহা তাহাদের মানবোচিত কোনও সাধনার অস্তিত্ব-বিষয়ে পর্য্যন্ত দারুণ সংশয় জাগাইয়া দেয়।

পাশ্চাত্য জাতিদের আদর্শ-ভ্রষ্টতা

কিন্তু তথাপি পাশ্চাত্যের একটা সাধনা আছে। আমরা প্রত্যেকেই যেমন অবিরত যোগাভ্যাস করিয়াও জানিতে পারিতেছি না যে আমরা যোগী, পাশ্চাত্যও তেমনি অজ্ঞাত-সারেই একটা সাধনা গড়িয়া তুলিয়াছেন, কিন্তু তাঁহারা তাহার খোঁজ রাখেন না। তাঁহারা যাঁহাকে নিজেদের সাধনা বলিয়া মনে করিতেছেন এবং আমাদের ন্যায় দাস্যভাবাচ্ছন্ন অবসন্ন কেন্দ্রচ্যুত জাতি-সমূহকে সাধনা বলিয়া মনে করাইতেছেন, তাহা তাঁহাদের সাধনা নহে, উহা পরস্বাপহারীর ছুরী-সানান মাত্র। তাঁহারা যে জাতিতে জাতিতে মিলিয়া বিশ্বজনীন মৈত্রীর দোহাই দিয়া সঙ্ঘ গড়িতেছেন, তাহা পাশ্চাত্য মনীষীদের মতেই দুর্ব্বলের উপরে পরাক্রান্ত দস্যুদলের ব্যূহবদ্ধ আক্রমণের গুপ্ত ষড়যন্ত্র মাত্র। এই সব জাতিসঙ্ঘ স্বার্থের উপরে মাত্র গড়িয়া উঠিতেছে, উহার সহিত কাহারও হৃদয়ের অণুমাত্র যোগ নাই, ইহা পাশ্চাত্য মনীষীদেরই সিদ্ধান্ত। যেদিন হৃদয়ের যোগ হইবে—ভগবান করুন, আজই তাহা হউক,— সেদিন প্রতীচীর উদ্ধত অস্ত্র খসিয়া ভূতলে পতিত হইবে, শত্রুতা ভুলিয়া এক জাতি অপর জাতির আলিঙ্গন-পাশে বদ্ধ হইবে। পাশ্চাত্যের হৃদয়ের ও মস্তিষ্কের গঠন উপযুক্ত ভাবে হয় নাই বলিয়াই তাহারা বুঝিতে পারিতেছে না যে, অস্ত্রের ঝঞ্ঝনা দিয়া কখনও যুদ্ধের চির-অবসান হইবে না,

created by Mukherjee TK,Dhanbad

হইতে পারে না। একমাত্র হৃদয় দিয়াই জাতির পর জাতি জয় করিতে হইবে, হৃদয় দিয়াই বিশ্বসঙ্ঘ গড়িয়া তুলিতে হইবে।

সাধনার পূর্ণতার দিনে প্রাচ্যে-পাশ্চাত্যে ভেদ নাই

পাশ্চাত্যেরা তাঁহাদের মেধা মনীষাকে কলকারখানার গোলাম করিয়া-রাখিয়াছেন, ফলে কামান-বারুদের স্তূপের চাপে হৃদয়টী চ্যাপ্‌টা হইয়া গিয়াছে। ছলে বা বলে পাশ্চাত্যেরা জাতির পর জাতিকে পরাধীনতার লৌহশৃঙ্খলে বাঁধিয়া ফেলিতে পারিতেছেন বলিয়া আমরা তাহাদিগকে ঈশ্বর বা আরাধ্য দেবতা ভাবিয়া তাঁহাদের দেখাদেখি কলকার-খানার কোলাহলকেই সভ্যতার ওঙ্কার-ঝঙ্কার বলিয়া ভ্রম করিতেছি। পাশ্চাত্যের অব্যবস্থিত সামাজিক বিশৃঙ্খলা বা উচ্ছৃঙ্খলতাকে আমরা স্বাধীনতার চূড়ান্ত মনে করিয়া বসিয়াছি এবং নিজেদের দৈনন্দিন জীবনে তাহার নকল করিতে যাইয়া পদে পদে নাকাল হইতেছি। আজ পাশ্চাত্য আত্মবিস্মৃত, আমরাও আত্মবিস্মৃত। পাশ্চাত্য তাঁহার আত্মস্বরূপ ফুটাইয়া তুলিতে পারিতেছেন না, আমরা আমাদের প্রস্ফুটিত আত্মস্বরূপ অন্ধত্ব হেতু দেখিতে পাইতেছি না। যে দিন পাশ্চাত্য তাঁহার স্বরূপ জাগ্রত করিবেন এবং আমরা আমাদের স্বরূপ দর্শন করিব, সেদিন পাশ্চাত্যের সহিত প্রাচ্যের পার্থক্য থাকিবে না,—আমরা যেমন ব্রাহ্মণ-

চণ্ডালের পার্থক্য ভুলিব, পাশ্চাত্য তেমনি সাদায়-কালায় তফাৎ ভুলিবেন। তখনই পাশ্চাত্যকে প্রাচ্যের অন্তরে, প্রাচ্যকে পাশ্চাত্যের অন্তরে প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব হইবে। কারণ, সাধনের পূর্ণতার দিনে প্রকৃতই দেখা যাইবে যে, প্রাচ্যে পাশ্চাত্যে ভেদ নাই।

ভারতকে আত্মস্থ হইতে হইবে

আজ পর্য্যন্ত যখন পাশ্চাত্যেরা ধনমদে, জনমদে, বলমদে অন্ধই রহিয়াছেন, তখন তাঁহারা আমাদিগকে পথ দেখাইয়া দিতে পারেন না; সে যোগ্যতার দাবী তাঁহাদের পক্ষে অনধিকার-চর্চ্চা, আর আমাদের পক্ষেও তাঁহাদিগকে চক্ষুষ্মান্ বলিয়া প্রমাণ করিবার প্রয়াস মিথ্যা চেষ্টা মাত্র। আজ আমাদিগকে নিজেদের অন্ধত্ব নিজেদেরই ঘুচাইয়া লইতে হইবে। পাশ্চাত্যের মুখপানে চাহিয়া থাকিলে কল্যাণ আসিবে না, সর্ব্বাঙ্গীণ পক্ষাঘাতের উপরে সর্ব্বাঙ্গীণ সর্পাঘাতই আমাদের অদৃষ্টে ঘটিবে। অতএব আজ যদি মরণের দুয়ার হইতে ফিরিয়া জীবনের মন্দিরে যাইতে চাহ, আত্মস্থ হও, আপনাকে চিনিতে শিখ, আত্ম-প্রত্যয়ের আলোকে পথ দেখিয়া লও।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

চিত্তশুদ্ধি

ভগবানকে বাদ দিয়া যে শিক্ষা চলিয়াছে, তাহার কুফলের জাজ্জ্বল্যমান দৃষ্টান্ত তোমরাই। কিন্তু ইহা ছাড়া যতদিন না চলিতে পারিতেছ, ততদিন এই সর্ব্বনাশা শিক্ষাকেই যে স্বীকার করিয়া চলিবে, তাহা বুঝি। তবে ইহাও জানিও, ইচ্ছা থাকিলে উপায় হয় এবং সঙ্কল্পের দৃঢ়তা থাকিলে এই শিক্ষাকে জীবনে অস্বীকার করিতে পার। করিবে কি না করিবে, সেই বিষয়ে আমি কোন পরামর্শ দিব না। তোমার অন্তরাত্মার কাছে জিজ্ঞাসা করিও, তিনিই যথাসময়ে যথোচিত উপদেশ দিয়া তোমাকে পরিচালিত করিবেন। অথবা আরও বলি, সঙ্কল্পের দৃঢ়তা যদি থাকে, তবে এই শিক্ষাকে স্বীকার করা সত্ত্বেও জীবনমধ্যে ধর্ম্মের সাধনা ও ভাগবতী চেতনাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে পার। সে সামর্থ্য তোমার করায়ত্ত।

কিন্তু এই বিষয়ে যাই কর আর না কর, সর্ব্বদা সর্ব্বপ্রযত্নে কুসঙ্গ বর্জ্জন করিয়া চলিবে।

"যদি তারে আনিস্‌রে ডেকে
তোর কি এমন আসন আছে
বসাবি তাঁকে ?

তোর, মলিন হৃদয়-আসন দেখে রে
চলে যাবে সে আপন ভবন।
কেমনে আর পাবিরে সে জন?"
(সতীশচন্দ্র)

যাহারা ভগবানকে চাহে, অথবা যাহারা ভগবানের বিচিত্র লীলার মধ্য দিয়া আত্ম-বিকাশই দেখিতে চাহে, তাহাদের চিত্তশুদ্ধির প্রয়োজন। পবিত্রতার অগ্নিতে যাবতীয় পাপ-চিন্তা, পাপ-প্রবৃত্তি, কলুষিত কামনা, উচ্ছৃঙ্খল উচ্ছ্বাস ভস্মীভূত না হইলে ভগবানকে ত' পাওয়া যায়ই না, এমন কি তুচ্ছ পার্থিব কল্যাণ-সমূহও সুদূর-পরাহত হইয়া পড়ে। ভগবান্ আপন ভবনেই আসেন, পরভবনে আসেন না। যে ভবনে ভগবানের জন্য অবিরত আলো জ্বলিয়াছে, মাঙ্গল্য শঙ্খ বাজিয়াছে, অঞ্জলির পর অঞ্জলি শ্রদ্ধার পুষ্পচয় সজ্জিত হইয়াছে, প্রীতির চূয়াচন্দনের অফুরন্ত সৌরভে দশদিশি আমোদিত হইয়াছে, যেখানে আলোকের সহিত পুলক জাগিয়াছে, সেইখানেই ভূলোকের মধ্যে গোলোক নামিয়া আসে এবং শ্রীভগবান চণ্ডালাধমের হৃদয়-মধ্যেও আপন ভবন নির্ম্মাণ করিয়া লন। তিনি সর্ব্বজীবে সমদর্শী, তাই কখনও জাতি-বিচার করিয়া ভক্তকে বঞ্চনা করেন না। যার যেমন ভাবনা, তিনি তার তেমন আপনা হন। ব্রাহ্মণের ঘরে জন্মিয়া সামাজিক রীতিতে মোটা যজ্ঞোপবীত ঝুলাইবার অধিকার

পাইয়াছে বলিয়াই তিনি কাহাকেও বেশী করিয়া পক্ষপাত করেন না; যার যতটুকু ভাব, তিনি তাহাকে ততটুকু লাভবান্ করেন। ফোঁটা-তিলক কাটিলেই নহে, কাষায় বসন পরিলেই নহে, ডিগ্‌বাজী খাইয়া শত তীর্থ ভ্রমণ করিলেই নহে, এক মাত্র চিত্তশুদ্ধি করিলেই তিনি আপনার হইতে আপন, জীবনের চেয়েও জীবন হইয়া থাকেন।

সুতরাং বাহ্য অনুষ্ঠানের অপেক্ষা না করিয়া, লোক-দেখান সাধুতার ভড়ং যথাসাধ্য বর্জ্জন করিয়া একমাত্র ভাবেরই গভীরতা সাধনের জন্য চেষ্টা করিলে, সেই চেষ্টা সার্থকতায় মণ্ডিত হয়। ভাববীজ তিনি নিয়তই দিয়াছেন এবং দিতেছেন, মনের সুবিস্তৃত জমি তিনি তোমারই জিম্মায় ফেলিয়া রাখিয়াছেন, এখন যেমন তুমি চাষ করিবে, তেমন তুমি ফসল কাটিবে। তোমার নিজের অবজ্ঞায়, উপেক্ষায় এবং বিরুদ্ধ বুদ্ধির দোষে তুমি এই জমি জঙ্গলে আকীর্ণ করিয়া রাখিয়াছ। ইহা পরিষ্কার না করিলে চাষ চলিবে কেমনে, ফসল কাটা ত' দূরের কথা। বুদ্ধির বিপর্য্যয়ে সমতল জমির উপরে দশ জায়গায় দশটা ডোবা অনর্থক খুঁড়িয়াছ, তোমাকে যে আবার অনবধানতায় ঐ ডোবাগুলিতেই ডুবিয়া মরিতে হইবে, তাহা ত' চিন্তা কর নাই। হাতের কাছে পুষ্টিকর খাদ্য-শস্যের বীজ প্রচুর থাকিতেও কেবল বেত-কাঁটার বীজই ছড়াইয়াছ, এখন যে গহন কণ্টক সমূলে উৎখাত না করিলে আর উপায় নাই।

কুসঙ্গ-বর্জ্জন

কুসঙ্গীরাই তোমাকে বেত-কাঁটার বীজ আনিয়া দিয়াছিল এবং যতদিন তাহাদিগকে "দূর, দূর" করিয়া দশ যোজন দূরে তাড়াইয়া না দিতে পারিবে, ততদিন আরও দিতে থাকিবে। তাই, তোমাকে কুসঙ্গ ত্যাগ করিতে হইবে। যাহাদের সংসর্গ তোমাদের হাত হইতে সৌভাগ্যের সঞ্চয় কাড়িয়া লইয়া গিয়াছে, যাহাদের সঙ্গদোষে তুমি রাজার ছেলে হইয়াও আত্মবিস্মৃতি-বশতঃ নিজেকে দীনাদপি দীন বলিয়া অবজ্ঞা করিতেছ, স্তূপীকৃত গুপ্তধনরাশির অধিকারী হইয়াও যাহাদের প্ররোচনায় তুমি ধূলিমুষ্টি আহরণের জন্য জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ ব্রহ্মচর্য্য নষ্ট করিয়াছ, তাহাদের ছায়াস্পর্শ পর্য্যন্ত হিংস্র জন্তুর সংসর্গের ন্যায় দুঃখদ জানিয়া ত্যাগ করিতে হইবে।

কু-সঙ্গী কে

কিন্তু কেবল মানুষকেই কুসঙ্গী মনে করিলে যথেষ্ট হইবে না। তোমার নিজের অনুষ্ঠিত কার্য্য, নিজের মুখের বাক্য, তোমার নিজের মনের চিন্তাও যদি কখনও তোমার প্রকৃত কল্যাণের বিরোধী হয়, তবে তাহাকেও কুসঙ্গী বলিয়া জানিও। রামা শ্যামা বন্ধুত্ব জমাইয়া তোমার পরম শত্রুর কাজ করিয়াছে, এবং আরও কত যদু-মধু তাহা করিবার সুযোগ-সুবিধা অন্বেষণ করিতেছে, সুতরাং ইহারা তোমার বর্জ্জনীয়। ইংরাজিতে যাহাকে "বয়কট" বলে, কেবল তাহাই করিলে

চলিবে না, ইহাদিগকে কায়মনোবাক্যে বর্জ্জন করিতে হইবে। ইহাদের সহিত লৌকিক কোনও প্রকার সম্বন্ধ না রাখিলেই তাহা কায়িক বর্জ্জন হইল, ইহাই ইংরাজী "বয়কট"। ইহাদের ভালমন্দ দোষগুণ প্রভৃতি কোনও বিষয়ের আলোচনা না করার নাম বাচনিক বর্জ্জন। ইহারা তোমাকে কুশিক্ষা দিয়াছে ত' দিয়াছে ; তার জন্য ইহাদিগকে নিন্দা করিলেই তোমার চরিত্রগঠন হইবে না। প্রণষ্ট মনুষ্যত্বকে লাভ করিতে হইলে মানুষোচিত শ্রেষ্ঠ গুণগ্রামের সাধন করিতে হইবে। নিন্দা দ্বারা চিত্তবৃত্তির অপকর্ষই সাধিত হয়, কারণ, নিন্দিত ব্যক্তির ধ্যান না করিয়া কি আর তাহার নিন্দা সম্ভব ? তাহাকে নিন্দা করিতে গিয়া বার বার আমরা তাহার কথাই চিন্তা করিতে থাকি এবং যদিও তাহার প্রতি বিরুদ্ধ চিন্তাই পোষণ করি, তথাপি প্রকৃত প্রস্তাবে তাহাকে মনের মধ্যে বেশী করিয়া জীয়াইয়া রাখি। রাবণ-রাজা শ্রীরামচন্দ্রকে শত্রুভাবে দেখিয়া তিন জন্মে মুক্তি পাইয়াছিলেন, আর প্রকৃত ভক্ত অনুরাগের দৃষ্টিতে দেখিয়া সাত জন্মে মুক্তি পাইয়াছিলেন।—এই কথাটা ত শুনিয়াছ ? ঐতিহ্য সত্যতার দিক্ হইতে না বুঝিয়া এই কথাটাকে যদি ভাবের দিক হইতে বুঝিতে চেষ্টা কর, তাহা হইলে অনায়াসেই ইহার মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে। আমার চিত্ত যখন ভগবানকে ছাড়া আর কাহাকেও জানিবে না, তখনই আমার মুক্তি।

রাবণ-রাজা রামচন্দ্রের প্রতি এতই বিদ্বিষ্ট হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, এক রামচন্দ্র ব্যতীত অপর কাহারও চিন্তা তাঁহার ছিল না। কিসে রামের পরাজয় হইবে, কিসে তিনি নিধন-প্রাপ্ত হইবেন, এই এক কথা ছাড়া রাবণ আর সব কথাই ভুলিয়া গেলেন এবং তাঁহার চিত্ত তাঁহার শত্রুর প্রতি এমন তন্ময় হইয়া গেল যে, পরম ভক্তের পক্ষে যাহা সাত জন্মের কর্মে সম্ভব হয় নাই, রাবণের পক্ষে তাহা তিন জন্মেই হইল। এই কাহিনীটা সত্য হউক, মিথ্যা হউক, সে বিচারের আবশ্যকতা নাই। কিন্তু ইহা হইতে যে একটী তত্ত্ব পাইতেছি, তাহা নির্ভুল। সেই তত্ত্ব এই যে, পারদ-বিন্দু যেমন স্বর্ণখণ্ডের উপর পড়িবামাত্র তাহা স্বর্ণের প্রতি রেণুকে নিজ রাসায়নিক প্রভাবের আবেষ্টনে বেড়িয়া ধরে, বিন্দু মাত্র বিদ্বেষ-বুদ্ধিও তেমনই বিদ্বেষ-ভাজন ব্যক্তিকে আঁকড়াইয়া ধরে। সোণা হইতে পারদকে যেমন বিচ্ছিন্ন করিয়া আনা যায় না, তেমনি বিদ্বেষ হইতেও বিদ্বেষভাজনকে পৃথক্ করা যায় না। কিন্তু বিদ্বেষ ত' আমারই মনের একটা রূপ। অতএব বিদ্বেষ করিয়া আমি ত' আমার মনটাকে বিদ্বেষ-পাত্রে অর্পণ করিলাম। বিদ্বেষ না করিলেই আমি তাহার নিরপেক্ষ অর্থাৎ তাহা হইতে স্বাধীন থাকিতে পারিতাম। মনে মনেও তাহার প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণ না করার নাম মানস বর্জ্জন। যাহারা তোমার ক্ষতি করিয়াছে, যাহারা তোমার মনুষ্যত্বকে

পদদলিত করিয়াছে, যাহারা তোমার চিত্তবৃত্তির উৎকর্ষাংশকে অন্যায়ে প্রভাবিত করিয়াছে, তাহাদের কাছ হইতে নিষ্কৃতি পাইবার শ্রেষ্ঠ পন্থা এই বর্জ্জন-নীতি। একটু বুঝিতে গেলে দেখিবে, এই কায়মনোবাক্যে বর্জ্জন প্রকৃত প্রস্তাবে সর্ব্বনিরপেক্ষ আত্মপ্রতিষ্ঠারই নামান্তর।

অবশ্য পাপীর প্রতি বিদ্বেষ বর্জ্জন করিলেও পাপের প্রতি বিদ্বেষ বর্জ্জন করিতে তোমাকে উপদেশ দিতে পারিতেছি না। সাধনার পথ, সাধনার ক্রম এবং সাধনার অভ্যাসের আনুপাতিক পরিবর্ত্তনের সহিত সকল উপদেশেরই পরিবর্ত্তন হইবে। সেই জন্যই যুগধর্ম্ম বলিয়া একটা কথা আছে। দেশ বুঝিয়া, কাল বুঝিয়া, পাত্র বুঝিয়া সর্ব্বদাই অবস্থানুসারে ব্যবস্থা করিতে হয়। এমন মানুষ আছেন এবং মানুষের মনের এমন অবস্থা আছে, যাহাতে পাপের প্রতিও ঘৃণা পোষণ অসম্ভব হইয়া পড়ে। তাহাদের কথা এখন বরং আলোচনার অন্তরালেই রাখিলাম। তোমার কাছে তোমার কথাই বলিব এবং যাহা তোমার এবং তোমারই মত অবস্থা-সঙ্কটে পতিত অপরের কাজে আসিবে, তাহাই এখন লিখিব। তাই, যে কথা বলিতেছিলাম, তাহাই ধরি।

কুকথা ও কুচিন্তা

বলিতেছিলাম, মানুষই শুধু কুসঙ্গী নয়, তোমার নিজের কার্য্য, নিজের বাক্য এবং নিজের চিন্তাও যথেষ্ট কুসঙ্গী।

অসৎ কার্য্যের সহায়ক বন্ধুবান্ধবদের ত্যাগ করিয়াও যদি অন্যায় কার্য্যেই রত রহিলে, তোমার কুসঙ্গ সম্পূর্ণ ত্যাগ হইল না। অসৎ কার্য্য হইতে বিরত হইয়াও যদি অসৎ বিষয়ের আলোচনা ত্যাগ না করিতে পারিলে, তাহা হইলেও কুসঙ্গ-বর্জ্জন সম্যক্ হইল না। কারণ, বাক্য কর্ম্মেরই প্রেরণা দেয়। যদি বল, কুকথা কহিব তাহাতে কি যায় আসে, আমার মন নির্লিপ্তই রহিল, তাহা হইলে তাহার খুব শক্ত রকমের একটা উত্তর আমি দিব। প্রথমেই আমি বলিব যে, তুমি একটা বিরাট্ মিথ্যাবাদী। কুকথা কহিয়া কুচিন্তা আসে না বা কুচিন্তা করিয়া কুকাজ কর না, এমন পরিচয় দিবার স্পর্দ্ধা যদি তোমার থাকিয়া থাকে, তাহা হইলে তুমি একটা অসাধারণ রকমের আত্মপ্রবঞ্চকও বটে। একটা কথার বা একটা চিন্তার যে কত বড় ক্ষমতা, তাহা তাঁহারাই জানেন, যাঁহারা একটী মাত্র মন্ত্রকে অবলম্বন করিয়া একনিষ্ঠ সাধন করিয়াছেন। যদি একাক্ষর প্রণব বার বার উচ্চারণে বা চিন্তনে ব্রহ্মত্ব লাভ সম্ভব হয়, তাহা হইলে কুকথা বার বার বলিলে অথবা কুচিন্তা বার বার করিলে অধোগতি কেন হইবে না? সুতরাং কুকথা এবং কুচিন্তা সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জন করিবে। এমন কি কাহারও সঙ্গে ঠাট্টা-চাতুরী বা রসিকতার জন্যও কুৎসিত প্রসঙ্গের উত্থাপন করিবে না!

কুকীর্ত্তি-দর্শন, কুকথা-শ্রবণ ও কুগ্রন্থ-অধ্যয়ন

চক্ষু দ্বারা কুকীর্ত্তি দর্শন, কর্ণদ্বারা কুকথা শ্রবণ এবং

গ্রন্থাদি পাঠের দ্বারা অপরের কুচিন্তার পরিচয় গ্রহণও প্রকৃত প্রস্তাবে কুসঙ্গই। বলিতে পার, নিজে ত' আর কিছু করিলাম না বা বলিলাম না, অন্যে কি করে বা বলে, তাহা লক্ষ্য করিতে কি দোষ? আচ্ছা, জিজ্ঞাসা করি, তোমার জীবনের ভালমন্দ সকল প্রকার আচরণের দিকে চাহিয়া বল দেখি, কোন্ কাজটী তুমি অপরের কিছু মাত্র অনুকরণ না করিয়া সম্পাদন করিয়াছ? নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস প্রভৃতি কতকগুলি স্বতঃপ্রেরিত ক্রিয়া ব্যতীত তোমার যাবতীয় অভ্যাসই কাহারও না কাহারও কিছু অনুকরণে গঠিত হইয়াছে। এই অনুকরণ-প্রবণতা আমাদের মধ্যে এতই সূক্ষ্মভাবে কার্য্য করিতেছে যে, মানুষের সঙ্গে মিশিয়া বা মানুষের কাহিনী মাত্র শুনিয়া অজ্ঞাতসারেই যে তাহার অনেকাংশ নকল করিয়া যাইতেছি, অনেক সময়ে খুব সজাগ দৃষ্টি রাখিয়াও আমরা তাহা ধরিতে পারি না। সুতরাং সাবধান! কুকাজ দর্শন করিবে না, কুৎসা, নিন্দা, পরচর্চ্চা শ্রবণ করিবে না, এমন কি মনের কোণেও কুদর্শনের বা কুশ্রবণের ক্ষীণতম আকাঙ্ক্ষা, ঔৎসুক্য বা কৌতূহলটুকুকে জাগিতে দিবে না।

গ্রন্থ-নির্ব্বাচন

পাঠের জন্য গ্রন্থাদি মনোনয়নেও বিশেষ সতর্ক থাকিতে হইবে। পবিত্র-হৃদয়, উন্নত-জীবন, শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিরা যে সব পুস্তকের প্রশংসা করেন, তাহা ব্যতীত অন্য কোনও পুস্তক

পড়িবে না। বিশেষ ভাবে উপন্যাস,—ইহা প্রাণান্তেও স্পর্শ করিবে না। কারণ, আজিকার দিনে বাংলার মাটিতে যে সাহিত্য গজাইয়া উঠিতেছে, উহার সাড়ে পনের আনাই হয় গ্রন্থকারের ব্যক্তিগত কুৎসিত মনোবৃত্তির কণ্ডূয়ন-প্রসূত হীন বিকার নতুবা তরল-চিত্ত উপন্যাস-পাঠকের প্রীত্যর্থে গ্রন্থকারের অর্থ-লালসা-সঞ্জাত পাপের ফাঁদ। তাই উহাতে হাব-ভাব-চপলা বিলাস-বিলোলা কটাক্ষ-কুটিলা কল্পনার ছড়াছড়ি। কাম-কাতরতা ও লালসা-বিহ্বলতা তাহার মূল উপাদান; আইনের নাগ-পাশে না বদ্ধ হইতে হয়, এই জন্য একটুকু বাহ্যশ্লীলতার চূণকাম আছে মাত্র। সাহিত্যালোচনার নাম দিয়া উহা পড়িতে গেলে অতি সহজে চিত্তের সংযম হারাইবে এবং মন অনায়াসে কলুষিত ও পঙ্কিল হইয়া পড়িবে। কারণ, ভালমন্দ যাহাই পড় না কেন, প্রত্যেক ভাবের একটা করিয়া ছবি ফটোগ্রাফের মত মনের উপর পড়িয়া যায়। ফটোগ্রাফ তবু বা কিছুদিন পরে জ্বলিয়া যায়, কিন্তু মনের ছবি একেবারে মনের সম্পূর্ণ বিনাশের পূর্ব্বে লয় পায় না; ফলে অতিশয় জঘন্য ও কুৎসিত দৃশ্য-সমূহের বোঝা মানুষকে জন্মজন্মান্তরের জন্য মনে মনে বহিয়া বেড়াইতে হয়।

প্রকৃত সাহিত্য ও আধুনিক সাহিত্য

বর্ত্তমান সময়ে যাহাকে সাহিত্য বলিয়া গ্রন্থকার ও গ্রন্থ-প্রকাশকেরা চীৎকার করিতেছেন, তাহা প্রকৃত প্রস্তাবে

"সাহিত্য" নহে, তাহাকে আমি "রাহিত্য" বলিব। সাহিত্য কথাটার ব্যুৎপত্তিগত অর্থ—সান্নিধ্য, সাহচর্য্য বা মিলন। যাহা আমার অন্তর্নিহিত উচ্চভাবগুলির সহিত একই মিলন-মঞ্চে আসন রচনা করিতে পারিল না, যাহা উহাদের উদ্বোধন করিয়া মহৎ কর্ম্মের সহিত তাহাকে প্রত্যক্ষরূপে সম্মিলিত করিতে পারিল না, যাহা আমার ব্যক্তিগত শত প্রকারের ক্ষুধা-তৃষ্ণার তাড়না ভুলাইয়া আমাকে সকলের সহিত প্রীতির অচ্ছেদ্য বন্ধনে বাঁধিয়া লইল না, তাহা সাহিত্য নহে,—রাহিত্য। সাহিত্য অসংযম নহে, উচ্ছৃঙ্খল নহে, স্বেচ্ছাতন্ত্রতা নহে। তাই, সাহিত্য সঙ্ঘ-গঠন করে, অসাহিত্য করে না। সাহিত্য অবনত জাতির অবসাদ-নিশ্চেষ্টতার মধ্যেও ঐক্যশক্তির প্রতিষ্ঠা করে এবং সর্ব্ববিধ বিচ্ছিন্নতা দূরীভূত করিয়া সংযমের মধ্যে স্বাধীনতার চূড়ান্ত অভিব্যক্তি প্রত্যক্ষীভূত করায়। ইহা মানুষকে তাহার সহজাত সৌভাগ্যে সংযুক্ত করে, অশেষ কল্যাণে মণ্ডিত করে, জীবনকে দুঃখ-দুর্দ্দৈবের ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে দৃঢ় এবং আনন্দযুক্ত করে।

আর আমাদের তথা-কথিত সাহিত্য কি করিতেছে? কামান্ধ লেখকের লেখনী লেফাকা-দুরস্ত করিয়া পূতিগন্ধময় জঘন্য আবর্জ্জনা ভদ্রঘরের স্ত্রী-পুরুষ-বালক-বৃদ্ধের পাত্রে কুণ্ঠাহীন নির্লজ্জতায় পরিবেশন করিতেছে, আর হতভাগ্য মূর্খেরা আর্টে'র দশ তারিফ দিয়া তাহাই অসীম আনন্দে

উদরস্থ করিতেছে এবং অন্তর্নিহিত পৌরুষ-ব্যঞ্জক ভাব-সমূহকে সেই বিষ-প্রয়োগে হত্যা করিতেছে। ইহা কি সাহিত্য, না কল্যাণ-রাহিত্য ? আজিকার কয়জন লেখকের লেখা আমাদিগকে উন্নিদ্র ও বিগতভী করিয়া অদম্য উৎসাহে চিত্তের শ্রেষ্ঠ ভাবসমূহকে শ্রেষ্ঠ কর্ম্মে রূপান্তরিত করিতে প্রেরণা দিতেছে ? কয়খানা গ্রন্থ আমাদের ব্যক্তিগত স্বার্থের চিন্তা ব্যক্তিগত ইন্দ্রিয়-লালসা, ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখের কথাকে ভুলাইয়া সমগ্র দেশ বা সমগ্র জাতির স্বার্থকে বড় করিয়া দেখাইয়াছে ? সমগ্র জাতির জীবন জুড়িয়া যে মৃত্যু এবং সমগ্র জাতির যৌবন জুড়িয়া যে জরা নৃত্য করিতেছে, কাম-বিহ্বল বা অর্থ-পিশাচ লেখকের লেখা ত' তাহারই সঙ্গে শুধু তাল বাজাইতেছে। আমাদের তথা-কথিত সাহিত্য প্রমাণিত করিতেছে যে, আমরা ভীরু, কাপুরুষ, ক্লীব ও কল্যাণ-বঞ্চিত। তাই, ইহাকে সাহিত্য না বলিয়া বলিয়াছি রাহিত্য। কিসের রাহিত্য ?—না,—উপায়-রাহিত্য, উত্থান-রাহিত্য, প্রতিষ্ঠা-রাহিত্য, পৌরুষ-রাহিত্য, যাহা কিছু মানুষকে মানুষ করে, তাহার সকলের রাহিত্য।

আদর্শই জাতীয় জীবনে শক্তির সঞ্চার করে। মরণোন্মুখ ভারত আজ সর্ব্বত্র আদর্শের কাঙ্গাল। তাহাকে যাঁহারা আদর্শ দিবেন, তাঁহারাই প্রকৃত সাহিত্যিক। যাঁহারা নিজের জীবনের কর্ম্মের মধ্য দিয়া আদর্শের বিকাশ করিবেন,

তাঁহারাই শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক। যাঁহারা নিজেদের লেখা ও বক্তৃতার মধ্য দিয়া অতীত ও বর্ত্তমান যুগের আদর্শ মানুষের আদর্শ কাহিনী প্রচার করিবেন, আগত অথবা অনাগত যুগের আদর্শ মানুষের জীবনী ভক্তিশুদ্ধ কল্পনার বলে গড়িবেন, তাঁহারা মধ্যম শ্রেণীর সাহিত্যিক আর যাঁহারা তাহা পাঠ করিয়া নিজ জীবনে আদর্শ ফুটাইবার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করিবেন, তাঁহারা তৃতীয় শ্রেণীর সাহিত্যিক। যাঁহারা এই তিন শ্রেণীর এক শ্রেণীর মধ্যেও নাই, তাঁহারা অসাহিত্যিক বা রাহিত্যিক।

জীবনের কাব্যই শ্রেষ্ঠ কাব্য। তোমাদিগকে এই মহাকাব্য রচনা করিতে হইবে। পরার্থে আত্মত্যাগ করিতে যাইয়া তোমরা যে শোণিত-বিন্দু-সমূহ দান করিবে, তাহার প্রত্যেকটী দ্বারা এক একটী অক্ষর লিখিত হইয়া এই মহাকাব্য রচিত হইবে, গণদেবতা চারি হাতে চারিভিতে ইহা লিখিবেন। এই মহাকাব্যের আখ্যানবস্তু বা প্রাণ হইবে তোমাদের মহোচ্চ লক্ষ্য, আর বিস্তার বা অলঙ্কার হইবে তোমাদের অটুট অধ্যবসায়।

আত্মশ্রদ্ধাই
আত্মোন্নয়নের
প্রথম সোপান।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

ছাত্রজীবনে বন্ধু-বান্ধব

ব্রহ্মচর্য্য-প্রয়াসী বিদ্যার্থীর পক্ষে বেশী বন্ধু-বান্ধব থাকা ভাল নয়। দেশের বর্ত্তমান নৈতিক আবহাওয়া তাহা সহিবে না। কাহার গায়ের বাতাস লাগিয়া মনের মাঝে কোন্ ভাব জাগিয়া উঠে, তাহা কে জানে? দুই চারিজন বন্ধু-বান্ধব যাঁহারা থাকিবেন, সর্ব্বদা লক্ষ্য রাখিবে, তাঁহাদের চরিত্র যেন অনিন্দ্য এবং আচরণ যেন সর্ব্বপ্রকার দোষের অতীত হয়।

ভাল ছেলে কাহাকে বলে?

সর্ব্বদা ভাল ছেলেদের সাথেই মিশিবে, কিন্তু মনে রাখিও, পড়াশুনায় ভাল হইলে তাহাকে ভাল ছেলে বলা যায় না। পরীক্ষার নম্বর দিয়া ছেলের ভাল-মন্দের বিচার করা নিতান্তই ভুল হইবে। যে ছেলে গরীবের দুঃখে গলে, রুগ্নের শুশ্রূষা ভালবাসে, দেহের চর্চ্চা করিয়া শক্তি-অর্জ্জনে উৎসাহবান্, সর্ব্বদা সৎকথার আলোচনা করে, সত্যকথা বলিতে নির্ভীক থাকে এবং মান্য ব্যক্তির মান রক্ষা করিয়া চলিতে জানে, তাহাকে ভাল ছেলে বলিব। তেমন ছেলে পরীক্ষায় কম নম্বর পাইলেও সকলের আদর্শ এবং তেমন ছাত্রের সংসর্গই প্রকৃত প্রস্তাবে কল্যাণকর।

বাক্-সংযম

বাচাল ছেলেদের বন্ধু জোটে বেশী, অতএব বিশেষ যত্নের সহিত বাক্-সংযম অভ্যাস করিবে; তাহা হইলেই বন্ধু-

সংখ্যা হ্রাস পাইবে। প্রতি সপ্তাহেই একটা নির্দ্দিষ্ট দিন অথবা প্রতিদিনই একটা নির্দ্দিষ্ট ঘণ্টা পূর্ণরূপে মৌনী থাকিতে অভ্যাস করিলে দেখিবে তোমার বাক্যের উপর কি অদ্ভুত প্রভুত্ব জন্মিয়াছে। স্কুলে পড়ার মাঝখানে যে আধঘণ্টা ছুটী পাও, সেই সময় এই নিয়ম পালন করিতে পার। বাক্-সংযমের অশেষ গুণ। ইহা পরোক্ষ ভাবে বীর্য্যের অতর্কিত অপচয় রুদ্ধ করে এবং প্রত্যক্ষ-ভাবে আয়ু বর্দ্ধিত করে। আমাদের প্রত্যেকটী নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের সহিত ক্রমশঃ আয়ু ক্ষয় হইতেছে। কথা কহিবার সময় নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস দ্রুততর হয় বলিয়া কথা কহিলে আয়ুও দ্রুত ক্ষয়প্রাপ্ত হয় সুতরাং কথাবার্ত্তা যত কমান যায়, ততই মঙ্গল। কথাবার্ত্তা কমান প্রথম সময়ে বড় কষ্টকর, কিন্তু যদি ভগবানের দিকে চিত্তাকর্ষণ করিবার চেষ্টা দিবারাত্র সর্ব্বদা করিতে থাক, তাহা হইলে দেখিবে, ভগবানের কথা ভাবিতে প্রাণে যে আনন্দের উদ্ভব হয়, বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সকল ইয়ার্কি-ফাজলামিতে তাহার লক্ষাংশের একাংশ নাই।

সাধুজন-প্রশংসা ও পরনিন্দা

সর্ব্বদা সাধুজনের প্রশংসা করিবে। কি ভাবে কোন্ মহাপুরুষ দুর্জ্জয় প্রলোভনকে জয় করিয়াছিলেন, কি ভাবে কে রাজ্যের চেয়ে ধর্ম্মকে বড় করিয়াছিলেন, কোথায় কাহার চরিত্রে ভোগের উপরে ত্যাগের গৌরব স্থাপিত হইয়াছিল,

সর্ব্বদা তাহার আলোচনা করিবে। ফলে তোমার সমক্ষে প্রলোভন আসা মাত্র তুমি মহদ্দৃষ্টান্তের শক্তিতে শক্তিমান্ হইয়া তাহা নিমেষে পদদলিত করিয়া যাইতে পারিবে।

পরনিন্দা

পূর্ব্বেও বলিয়াছি, এখন আবার বলিতেছি, কখনও পরনিন্দা করিবে না। রাম লম্পট, শ্যাম উচ্ছৃঙ্খল, যদু পরস্বাপহারী, মধু মিথ্যাবাদী প্রভৃতি আলোচনা করিতে করিতে ধীরে ধীরে মনের উপর অনৈতিকতার দুরপনেয় চিহ্ন পড়িয়া যায়! লোকের দোষের দিকে দৃষ্টি দিতে দিতে মনের এমন একটা অন্ধত্ব জমিয়া যায় যে, খুব ভাল লোকেরও চরিত্রের উজ্জ্বল দিক্‌টা চক্ষে পড়ে না; বিশ্বামিত্রের অলোকসামান্য পুরুষকার উপেক্ষিত হইয়া মেনকাঘটিত সাময়িক অসংযম তখন বড় হয়, রাণা প্রতাপের অতুলনীয় স্বদেশ-প্রেম অগ্রাহ্য হইয়া একটা সাময়িক অবসাদ-প্রসূত অস্থায়ী অধীনতা-স্বীকৃতি-পত্র বেশী আলোচনার বিষয় হয়, স্বামী বিবেকানন্দের অপ্রতিম স্বজাতিবাৎসল্য ও অপূর্ব্ব পৌরুষ তুচ্ছ হইয়া তাঁর হ্যাট-কোট পরাটাই সামাজিক ফৌজদারী আইনরূপ রাহু-গ্রহের কবলে পড়ে। তখন মনে হয়, ইহ-সংসারে নির্দ্দোষ ব্যক্তি নাই, নিষ্কলঙ্ক চরিত্র নাই বা নিখুঁত আদর্শ নাই। সবই ভাঙ্গা, সবই বাঁকা, সবই কোনও না কোনও দোষের আবাস-

স্থল। ফলে, মানুষের শক্তিসামর্থ্যের উপর মানুষের বিশ্বাস ক্ষুণ্ণ হয় এবং ধীরে ধীরে আত্মবিশ্বাসও নষ্ট হয়।

আত্ম-নিন্দনের দোষ

পরনিন্দাই যে কেবল দূষ্য, তাহা নয়, আত্মনিন্দাও মহাপাপ। আমার মত পাপী নাই, আমার মত কামুক নাই, প্রভৃতি বলিয়া বেড়ান একটা পৌরুষ নহে। নিজেকে অধঃপতিত ভাবিতে ভাবিতে অধঃপতনেরই ভিত্তিকে শক্ত করিয়া দেওয়া হয়। যাহা করিয়াছ ত' করিয়াছ; তার কি? আজ হইতে তুমি শ্রীভগবানের নাম লইয়া শক্ত চরণে সোজা মেরুদণ্ডে দাঁড়াও, আর কখনও পাপ তোমার কাছে ঘেঁষিতে পাইবে না। যে মুহূর্ত্তে তুমি জোর করিয়া বলিবে—"আমি কামলাঞ্ছন, মৃত্যুঞ্জয় বীর"—ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই দেখিবে, রিপুকুল তোমার পদানত হইয়া পড়িয়াছে। কাল তুমি অসংযত হইয়াছিলে বলিয়াই আজ তোমার সংযত হইবার সম্ভাবনা আছে। তুমি যে মানুষ! তুমি ত' গাছ-পাথর নও। উত্থান পতন লইয়াই মানুষের জীবন। কাল তোমার পতন হইয়াছিল, আজ তোমারই পরাক্রম-প্রভাবে উত্থান ঘটিবে। জগতের ইতিহাস খুঁজিলে কত রত্নাকর যে বাল্মীকি হইয়াছেন, কত জগাই মাধাই যে উদ্ধার হইয়াছেন, তাহার অসংখ্য দৃষ্টান্ত পাইবে। সেই দৃষ্টান্ত হইতে শিক্ষা কর, তোমার জীবনেও নূতন উষার আলোক পড়িবে, মলয়-মারুতের চন্দন-

গন্ধ লাগিবে। নিরাশ হইও না, অবশ হইও না,—নির্ভর কর, নির্ভর হও; তোমার আত্মশক্তিতেই অসংযত চিত্ত-বৃত্তি শান্ত হইবে, আত্মশক্তিই তোমাকে মুক্ত ও মহান্ করিবে।

অসত্যের অভিনয়

সর্ব্বদা সাবধান থাকিবে কখনও যেন কৌতূহল-বশেও অসত্যের অভিনয় না কর বা তাহাতে গৌণ ভাবেও যোগ না দেও। সাধুর ভাণ করিয়া কত পাপিষ্ঠ যথার্থ সাধু হইয়া গিয়াছে, অসাধুর ভাণ করিয়া কত যথার্থ সাধুর অধঃপতন হইয়াছে, কে তাহার ইয়ত্তা করিবে? ঠেকিয়া না শিখিয়া এ বিষয়টা যাহাতে আমরা দেখিয়া শিখিতে পারি, তার জন্য আমাদের আগে হইতেই সতর্ক হওয়া প্রয়োজন।

ভগবৎ-সঙ্গীতের শক্তি

মনকে সর্ব্বদা স্বচ্ছ ও পাপমুক্ত রাখিতে ভগবদ্বিষয়ক সঙ্গীত অদ্বিতীয় সহায়। যে সঙ্গীতে সরল মনের সরল প্রার্থনা সরল ভাবে করা হইয়াছে, তাহাই তোমাদের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা উপযোগী। কারণ, উহাই মনের ভাব সমূহের পুষ্টি-সাধনে সমধিক সমর্থ। যে সকল কীর্ত্তনের গূঢ়তত্ত্ব বুঝিতে পারিবে না, প্রথম সময় তাহা বর্জ্জন করিবে। বিভিন্ন অধিকারীর জন্য বিভিন্ন সাধনের ব্যবস্থা আছে। রাধাকৃষ্ণ তত্ত্বমূলক কীর্ত্তনাঙ্গের সঙ্গীত ব্রহ্মচারীদের পক্ষে হজম করা সম্ভব হইবে কিনা জানি না। যাহাদের জীর্ণ হয়, তাহারা গ্রহণ করুক। যাহাদের

জীর্ণ হয় না, তাহাদিগকে উহা বর্জ্জন করিয়া চলিতে হইবে। জয়দেব, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস বা রায় রামানন্দ প্রভৃতি মহাত্মাদের পক্ষে যুগলমিলনের যে তত্ত্ব সহজপাচ্য ও হৃদয়গ্রাহী, অগঠিতমনা অগঠিত-মস্তিষ্ক একটী অন্নপ্রাশনের বালকেরও যে তাহা উপকারী হইবেই হইবে, এমন মাথার দিব্যি নিতান্ত পাগল ব্যতীত অপরে দিতে সাহস পাইবে না।

গগন পবন মন্দ্রিত করি'
উঠুক ভারতে আবার সে গান,
অলসের ঘুম ভাঙ্গাইয়া দিতে
মুমূর্ষুগণে প্রদানিতে প্রাণ।

নবজীবনের অমোঘ অমিয়
নবচেতনার করুক উদয়,
টুটে যাক্ যত অতীতের পাপ
ভোগ, বিলাসিতা, স্বার্থ-নিচয়।

সরল হইয়া সত্য হইয়া
ভগবান্ আজ আসুন প্রাণে,
তিনিও জাগেন আমরাও জাগি
মুখরিত করি' তেমন গানে॥

উনবিংশ পরিচ্ছেদ

শিক্ষকের প্রতি শ্রদ্ধা

বিদ্যালয়ের শিক্ষকের বিদ্যাদানের যোগদানের অযোগ্যতা যাহাই থাকুক না কেন, তাহার কাছে শিখিবার মত যতটুকু পাইবে, ততটুকু শ্রদ্ধাপুর্ণ-চিত্তেই গ্রহণ করিবে। সামান্য শিখিলেও অশ্রদ্ধার সহিত শিখিও না। একটা নিরক্ষর মূর্খের কাছ হইতেও গ্রহণ-যোগ্য উপদেশ পাইলে তাহা শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করিতে পারিলে কল্যাণ আছে মনে রাখিও, জগতে তোমাকে কল্যাণ বিতরণ করিতে হইবে ; আজ এই যৌবনের প্রথম উন্মেষে যেখানে যতটুকু পাও, সাগ্রহে আহরণ করিয়া লও।

ক্লাসের মধ্যে অঙ্গস্পর্শ

ক্লাসে উপবেশন করিতেও যথাসাধ্য অপরের দেহ স্পর্শ বর্জ্জন করিবে। একের দেহ হইতে অপরের দেহে অনেক অকুশল সংক্রামিত হইয়া থাকে ; একের দেহাভ্যন্তরস্থ পাপমলিন প্রভাব সর্ব্বদাই স্পৃষ্ট ব্যক্তির উপরে ক্রিয়া করে। যাহাদের দেহ ও মন সংযম-শুদ্ধ ও তপঃপবিত্র নহে, তাহাদের পক্ষে এই সূক্ষ্মপ্রভাব অতিক্রম করা অসাধ্য। যাঁহারা সাধনের বলে উপরে উঠিয়াছেন, এই সকল প্রভাব কেবল তাঁহাদের প্রভাবের কাছেই খর্ব্ব হইয়া সজোরে নিক্ষিপ্ত রবারের বলের ন্যায় ফিরিয়া আসে।

ক্লাসে উপবেশন

ক্লাসের মধ্যে আসন করিয়া বসিতে পার আর না-ই পার, মেরুদণ্ড সরল রাখিয়া এবং বক্ষঃস্থল স্ফীত করিয়াই উপবেশন করিবে। মনোমধ্যে একটা বীরত্বপুর্ণ-কল্পনা পোষণ করিলে দেখিবে, প্রথম প্রথম দুই চারিদিন দৈহিক অভ্যাসের বিপর্য্যয় হেতু একটা অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ হইলেও অনায়াসেই সোজা হইয়া বসিতে পারিবে। চিন্তার ক্ষমতা অসীম। একমাত্র একান্ত চিন্তা দ্বারা মানুষ নিজের সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে দেহমনের গঠন পর্য্যন্ত পরিবর্ত্তিত করিয়া দিতে পারে। বীর হইবার আকাঙ্ক্ষা প্রাণে জাগিলে, মাঝে মাঝে তুমি ভুলিয়া বাঁকা হইয়া বসিলেও সেই আকাঙ্ক্ষাই তোমার কাণ ধরিয়া সোজা করিয়া বসাইয়া দিবে। পথ চলিতেও বীরের মত চলিবে। কথা বলিতেও বীরের মতই বলিবে। পুরুষত্বহীন পঙ্গুর মত কখনও যেন ক্ষীণকাতর পদসঞ্চারে চলিও ফিরিও না।

ছত্র, পাদুকা ও বস্ত্রাদি

পাদুকা ও ছত্র ব্যবহার হিতজনক। বিনা পাদুকায় ভ্রমণে চক্ষুর অপকার হয়। ছত্র ধারণ করিলে চক্ষুর জ্যোতিঃ বর্দ্ধিত হয়, সুতরাং ইহা ব্যবহার করাই উচিত। তবে মাঝে মাঝে উহাদের ব্যবহার সাময়িকভাবে পরিত্যাগ করিয়া দেহকে কষ্টসহিষ্ণু করিবার চেষ্টাও একান্ত প্রয়োজনীয়।

অন্যের ব্যবহৃত ছত্র, পাদুকা, বস্ত্রাদি ব্যবহার করিবে না। জামা-কাপড়ের বিলাসিতা বর্জ্জন করিবে। যথার্থ পুরুষের পক্ষে তাহার পৌরুষই যথেষ্ট অলঙ্কার। যাহার দেহে দৃঢ়তা আছে, মনে বল আছে, হৃদয়ে সাহস আছে, তাহার পক্ষে পরিচয়-পত্র এবং বেশভূষার আতিশয্য উভয়ই নিরর্থক। যাহারা স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যে সমৃদ্ধ, সামান্য বনফুলও তাহাদের অঙ্গকান্তির অপরূপ শোভা বিস্তার করে। কিন্তু সে সম্পদ হইতে যাহারা বঞ্চিত, কোহিনুর পরাইলেই কি তাহারা সুন্দর হয়? একটা ভাত-রাঁধা কালো হাঁড়ীর উপরে অষ্ট্রেলিয়ার সোণার খনিগুলিকে চাপাইয়া দিলেই কি তাহা সুশ্রী হইবে? সর্ব্বদা মনে রাখিও, তোমার নিজস্ব গুণাবলী দ্বারাই তোমার যথার্থ মূল্য নির্ণীত হইবে, তোমার বেশভূষা দ্বারা নহে। পোষাকের চটকে বোকা ভুলান যায়, কিন্তু চক্ষুষ্মান জগৎকে ভুলাইয়া রাখা চলে না। ময়ূরপুচ্ছধারী কাক একদিন না একদিন ধরা পড়েই এবং তাহার লাঞ্ছনার একশেষ হয়ই।

যাহাদের আত্মশ্রদ্ধা নাই, নিজের শক্তি-সামর্থ্য এবং অধ্যবসায়ের উপরে অনুকূল বিশ্বাস নাই, তাহারাই মানুষের দরবারে নিজের দাম বাড়াইবার জন্য চমকদার সাজ-পোষাক করিতে চাহে। আর, আত্মপ্রত্যয়শীল ব্যক্তি জানেন যে, উলঙ্গ হইয়াও যদি তিনি বিশ্বের সমক্ষে দণ্ডায়মান হন, তথাপি তাহার প্রাপ্য গণ্ডার এক কড়া কম দিবার সাধ্য কাহারও নাই।

তাই তিনি সর্ব্বপ্রকার বিলাসিতাকে ঘৃণার সহিত পদাঘাতে দূরে নিক্ষেপ করেন। "আপরুচি খানা, পররুচি পহর্‌না, এই কথা সত্য ও মিথ্যার মধ্যে আপোষ-মীমাংসার পক্ষপাতী দুর্ব্বলচিত্ত ব্যক্তির মুখেই শোভা পায়। পুরুষের মত পুরুষের পক্ষে খানাও যেমন আপ্‌রুচি, পহর্‌ণাও তেমন আপ্‌রুচি।

যে ভারত বিলাসিতায় আত্মহত্যা করিয়াছে, সেই ভারতেরই প্রেতাত্মা আজ তাহার বংশধরদের কাছে সর্ব্ব-ত্যাগের পিণ্ড প্রার্থনা করিতেছে। এই পিণ্ড প্রদান করিতে পারিলে, তবে তাহার উদ্ধার হইবে। কিন্তু ইহা প্রদান করিতে তোমাকে মস্তক মুণ্ডন করিয়া জাতীয় জীবন হইতে সমস্ত কলঙ্ক-কালিমা ক্ষুর-প্রয়োগে একেবারে চাঁছিয়া ফেলিতে হইবে। আজ তুমি সেই কর্ত্তব্য হইতে কি পরাঙ্মুখ হইয়া রহিবে ভাই? আজ কি তোমার বক্ষ জুড়িয়া জননী-জন্মভূমির দুঃখ কোনও আলোড়নই উত্থিত করিবে না?

ধর্ম্মই

ভারতের জাতীয় প্রতিভা।

বিংশ পরিচ্ছেদ

বিদ্যালয়ান্তে

স্কুল হইতে গৃহে ফিরিয়া বস্ত্রাদি পরিবর্ত্তন করিবে। উপযুক্ত বিশ্রামান্তে হাত মুখ প্রভৃতি ধৌত না করিয়া জলযোগ করিবে না। জলযোগের পরে শরীরের সুস্থতা ও সময়ের সঙ্গতি বুঝিয়া কিছুক্ষণ জ্ঞানচর্চ্চা করিবে। তৎপরে নিয়মিত ব্যায়াম সমাপন করিবে। নির্দ্দিষ্ট ব্যায়াম একা একা করিতে সব সময় মজা লাগিয়া উঠে না, অতএব দশজনে মিলিয়া করিতে চেষ্টা করিবে। তাহাতে ক্রীড়াদির ন্যায় আনন্দ-উল্লাস যেমন পাইবে, তেমন মাঝে মাঝে ছুতা-নাতা ধরিয়া আলস্যবশে ব্যায়াম বাদ দেওয়ার যে রীতি প্রচলিত আছে, তাহা হইতে রক্ষা পাইবে।

ব্যায়াম ও ক্রীড়া-কৌতুক

নির্দ্দিষ্ট রকমের ব্যায়াম ব্যতীত মাঝে মাঝে নৌচালন, অশ্বারোহণ, সাইকেল-চালান, দৌড়াদৌড়ি, লম্ফ-ঝম্ফ, বৃক্ষারোহণ, নিম্ন হইতে উচ্চে, উচ্চ হইতে নিম্নে অতি দ্রুত আরোহণ প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার শক্তিসাপেক্ষ ক্রীড়া-কৌতুকের যথেষ্ট অভ্যাস রাখিবে। সন্তরণ-শিক্ষা স্নানের সময়ই চলিতে পারে। মানুষের মত আত্মসম্মান লইয়া থাকিতে হইলে, উচ্চশির যেখানে সেখানে নত করিয়া রহিতে না চাহিলে, একটা সুদীর্ঘ জীবনে কত স্থানে যে কত রকমে শারীরিক শক্তির প্রয়োজন হয়, তাহা বলিবার নহে।

শারীরিক শক্তির সহায়তা লইয়া যাঁহারা জীবনের অনেক অকল্যাণকে ধ্বংস করিয়াছিলেন, তাঁহাদের জীবন-কাহিনী পড়িবে এবং আলোচনা করিবে। তাঁহাদের জীবনের ঘটনা-সমূহ হইতে দৃষ্টান্ত লইয়া নিজেদিগকেও সর্ব্বতোভাবে সেইরূপ অবস্থার জন্য প্রস্তুত করিতে প্রয়াসী হইবে। অধ্যবসায় ছাড়া জগতের কোনও কাজ হয় নাই, একটা পিপীলিকাও তার সামান্য জীবনযাত্রাটুকু অধ্যবসায় ছাড়া চালাইতে পারে না। অতিমানুষ দৈহিক ও মানসিক শক্তি অর্জ্জন করিতেও তোমাকে অসামান্য দৈহিক ও মানসিক অধ্যবসায় অবলম্বন করিতে হইবে।

ব্যায়ামান্তিক অঙ্গমর্দ্দন

ক্রীড়া ও ব্যায়ামাদির পর অঙ্গ-মর্দ্দন করিয়া উপযুক্ত কাল অনলস বিশ্রাম লইবে এবং সমগ্র শ্রম অপনোদিত হইলে, ত্রিসন্ধ্যা স্নান অভ্যাস-গত হইয়া থাকিলে সূর্য্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গেই স্নান করিবে। স্নানান্তে উপাসনা।

নৈশ-অধ্যয়ন

রাত্রিতে অধিক পড়াশুনা করিও না। রাত্রির প্রথমাংশেই ক্ষুধা-যোগ্য লঘুপাক ও পরিমিত আহার গ্রহণ করিয়া শয়ন করিতে চেষ্টা করিবে। আহারের পরক্ষণেই শয়ন নিষিদ্ধ। কিছুকাল পায়চারি করিয়া তারপরে নিদ্রার চেষ্টা কর্ত্তব্য।

দৈনিক আত্ম-পরীক্ষা

শয়ন করিবার পূর্ব্বে সমগ্র দিনের কাজের একটা হিসাব

লইবে। দিনলিপি (ডাইরী) বহিতে নিজের দোষগুণগুলি অকপটে লিখিবে। কোন্ কোন্ কর্ত্তব্য কার্য্য তোমার অক্ষমতায় কোন্টা বা আলস্যে ঔদাস্যে বাকী রহিয়া গেল, তাহার সূক্ষ্ম বিচার করিবে! আজ তোমার দ্বারা জগতের কয়টা কল্যাণ হইল, কয়টা হইতে পারিত অথচ হইল না, এসবও উল্লেখ করিবে। ইহা দ্বারা তোমার আত্মবিশ্লেষণের ও প্রলোভন জয় করিবার ক্ষমতা বাড়িবে এবং ভাগবত মহত্ত্ব প্রতি অনুষ্ঠানে প্রকাশ পাইতে পারিবে।

শয্যা

কুশাসন, কম্বল বা মাদুর প্রভৃতি সহজ-লভ্য সাধারণ শয্যায় শয়ন করিবে। লেপ, গদী, তোষক, প্রভৃতি অনাবশ্যক আড়ম্বর করিতে এই বলিয়া লজ্জায় মরমে মরিয়া যাও যে, লক্ষ কোটি নিরাশ্রয় নরনারীর দুঃখ দূর করিতে অণুমাত্র চেষ্টা তুমি করিতেছ না। অন্তরের অন্তরে অনুভব কর, তোমার ভোগ-চেষ্টা ভগবানের অভিসম্পাত আকর্ষণ করিতেছে।

মশারি ব্যবহার করিবে। কখনও অন্যের ব্যবহৃত শয্যায় শয়ন করিবে না অথবা একই বিছানায় দুই তিন জন নিদ্রা যাইবে না। একাকী শয়নই ব্রহ্মচারীর পক্ষে অত্যাবশ্যক বলিয়া জানিবে। গুরুজনদের সহিত শয়নও সময়-বিশেষে হিতকর।

শয়নের পূর্ব্বে একগ্লাস শীতল জল সেবনে সুনিদ্রা হয় ও কোষ্ঠ পরিষ্কার থাকে এবং অণ্ডকোষ শীতল জল দ্বারা ধৌত করিলে সুপ্তিস্খলনের সম্ভাবনা কমিয়া যায়।

একবিংশ পরিচ্ছেদ

সুপ্তিস্খলন

ব্রহ্মচর্য্য প্রতিপালনে যাহারা অবহেলা করিয়াছে, যত প্রকার উপদ্রব তাহাদিগকে ব্যতিব্যস্ত করে, তন্মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা যন্ত্রণাদায়ক হইতেছে সুপ্তিস্খলন। মাসাধিক কালের আহার্য্য-বস্তু ব্যায়ামাদি দ্বারা পরিপাক পাইয়া যতটুকু বিশুদ্ধ শুক্রে পরিণত হইয়াছে, কর্ম্মদোষে তাহার সবটুকু এক রাত্রিতে ক্ষয়িত হইয়া যাইতে পারে। দেখিতেছ তোমার কামলিপ্সা আর নাই, ধাক্কা খাইয়া খাইয়া অনেক শিক্ষা পাইয়াছ, তাই আর তুমি কুসঙ্গে যাইতে চাহ না, কুকার্য্যে মজিতে চাহ না, কুৎসিত আলোচনা বা জঘন্য দৃশ্য দর্শনাদি কঠোর ভাবেই পরিত্যাগ করিয়াছ, তথাপি একদিন সহসা তোমার সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারেই শুক্রস্খলন হইয়া গেল। মানুষ যখন অসৎ পথ ছাড়িয়া সুপথে চলিতে প্রাণপণ চেষ্টা করিতে থাকে, সদ্ গ্রন্থপাঠ, সাধুসঙ্গ এবং সদ্‌গুরুলব্ধ সাধনের দ্বারা ক্রমশঃ আবার উন্নতির পদবীতে আরোহণ করিতে থাকে, সেই সময়েও মাঝে মাঝে এইরূপ বিপৎপাত হইয়া তাহাকে একেবারে হতাশ করিয়া দেয়। সে ভাবে, এত করিয়াও যখন বীর্য্যক্ষয় বন্ধ করিতে পারিতেছি না, এত চেষ্টার পরেও যখন সাফল্য করায়ত্ত হইতেছে না, তখন ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা করা

নিশ্চয়ই একান্ত অসম্ভব। উহা প্রাচীন যুগের অতি বৃদ্ধ ঋষিদের বার্দ্ধক্য-জনিত বিকারোক্তি বা গাঁজাখুরি কল্পনা মাত্র।

বলাই বাহুল্য, দুর্ব্বলচিত্ত ব্যক্তিরা হতাশায় অবশ হইয়া এইরূপ অনেক কথাই বলিতে পারে। কিন্তু তাহাদের কথা প্রকৃত প্রস্তাবে সত্য নহে। ব্রহ্মচর্য্যবিরোধী অভ্যাসের মোহে মজিয়া যাহারা ভরা যৌবনের প্রায় অর্দ্ধেকটা কাটাইয়া দিয়াছে, এমন ব্যক্তিও সুদৃঢ় সঙ্কল্পের প্রভাবে বলীয়ান্ হইয়া বৃদ্ধ বয়সেও যৌবনের শক্তিসামর্থ্য, মেধা-মনীষা অটুট রাখিয়াছে, এরূপ দৃষ্টান্ত আছে। যদি সঙ্কল্পে অটুট রহিতে পার, যদি জীবনও যায়, তথাপি কিছুতেই ব্রহ্মচর্য্যব্রত ভঙ্গ হইতে দিবে না, এমন সুদৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিতে পার এবং দিক্‌পাশ না চাহিয়া একমনে এক ধ্যানে তুচ্ছাতিতুচ্ছ প্রত্যেকটা নিয়মের খুঁটিনাটি পর্য্যন্ত শ্রদ্ধাপূর্ণ-চিত্তে প্রতিপালন করিতে পার, নিশ্চয়ই তোমাতে ব্রহ্মচর্য্য অক্ষুণ্ণ-রূপে প্রতিষ্ঠিত হইবে। যে ঔদাস্যে তোমার সর্ব্বনাশ ঘটিয়াছে, অসামান্য উদ্যমশীলতায় তাহাকে পরাজিত কর, অক্লান্ত অধ্যবসায়ে তোমার পূর্ব্ব-লব্ধ সংস্কার-সমূহকে নিরস্ত কর। তোমার পূর্ব্ব পূর্ব্ব অভিজ্ঞতার সংস্কারকে সম্যক্ নাশ করিতে হইবে, তবেই ব্রহ্মচর্য্যবিরোধী সকল প্রতিক্রিয়ার বিনাশ ঘটিবে। আজ তুমি কদভ্যাসকে ত্যাগ করিয়া থাকিলেও তোমার মনের গায়ে তাহা অগোচরে লগ্ন হইয়া রহিয়াছে। দৃষ্টির

স্থূলতানিবন্ধন তাহা দেখিতে পাইতেছ না, কিন্তু যতদিন কুকার্য্যের দাগ তোমার মনোদেহে লাগিয়া থাকিবে, ততদিন পূর্ণ ব্রহ্মচর্য্য প্রতিষ্ঠিত হইবে না। তাই, এই মুহূর্ত্তেই প্রস্তুত হও। নিমেষমাত্র বিলম্ব না করিয়া মনের পাপ মন হইতে দূর করিয়া দাও।

কিন্তু কেমনে দূর করিবে? দূর করিবে, দেহকে দিবারাত্র জগৎ-কল্যাণ-কর্ম্মে বিব্রত রাখিয়া, মনকে অহর্নিশ ভগবানের চিন্তায় নিবিষ্ট রাখিয়া। দেহকে অবসর দিলেই তাহার পূর্ব্বাভ্যস্ত কামোন্মুখতা জাগিয়া উঠিবে, মনকে অবসর দিলেই তোমার ইচ্ছার অজ্ঞাতে সে বিলাসের রাজ্যে ছুটিয়া যাইবে। সুতরাং আর নিমেষমাত্র বিলম্ব করিও না। এখনই একটা কিছু কাজে লাগিয়া যাও, এমন কাজ, যাহাতে লালসার বস্তুর উপরে পতিত হইবার সুযোগ চক্ষুর না থাকে, যাহাতে কামনার কথা শুনিবার অবসর কর্ণ না পায়, যাহাতে পার্থিব জগতের তুচ্ছ আকাঙ্ক্ষার কথা কহিবার অবকাশ জিহ্বার না ঘটে। যদি কাজ না পাও, এখনই একটা কিছু গড়িয়া লও। দেশের ও জাতির কত অভাব কত অভিযোগ, ইহার একটা কি একাধিকের প্রতীকারকে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের ন্যায় অবশ্য প্রয়োজনীয় মনে করিয়া লাগিয়া যাও। যাহা তোমার শক্তিতে কুলাইবে না বলিয়া মনে হইতেছে, তাহাই খুব শক্ত করিয়া ধর। তোমার দেহ ও মনের যাবতীয় চেষ্টাকে ঐ

একটী মাত্র আসন্ন কর্ত্তব্যে ধরিয়া রাখিবার জন্য উহা কতক পরিমাণে অসম্ভব হওয়াই দরকার। যে কাজে তোমার সমগ্র বুদ্ধিবৃত্তির ডাক পড়িবে, যে কাজে তোমার দৈহিক ও মানসিক সম্বলের যথাসর্ব্বস্ব একেবারে ঝোলা ঝাড়িয়া ব্যয় করিতে হইবে, তেমন কাজই ধর। আপ্রাণ শক্তিতে ঐ একটী নির্দ্দিষ্ট কল্যাণকর্ম্ম করিয়া যাও, তারপর যাহা হইবার হউক, প্রাণ থাকুক আর যাউক।

কাজে লাগামাত্রই মনের প্রচ্ছন্ন কামলিপ্সা দূর হইয়া যাইবে না, সুতরাং স্বপ্নস্খলনও একদিনেই বন্ধ হইবে না।—

আত্মসুখ ইচ্ছামাত্রে বীর্য্য-অপচয়
বিশ্বসুখ চিন্তামাত্রে আনন্দ-উদয়

অতি সঙ্গোপনেও যদি ভোগের ইচ্ছা চিত্তমধ্যে জাগ্রত হয় এবং সেই ইচ্ছার স্থিতিকাল যদি নিমেষমাত্রও হয়, তথাপি তাহাতে বীর্য্যক্ষরণ হইবেই, ইহা প্রতিরোধ করিবার ক্ষমতা কাহারও নাই। দৃষ্টান্তস্বরূপ আয়ুর্ব্বেদকার বলিয়াছেন,—কলসীর সর্ব্বাঙ্গ চুয়াইয়া চুয়াইয়া যেমন জলবিন্দু পতিত হয়, সম্ভোগকামনা অথবা শুক্ররেচক অন্যান্য কারণ উপস্থিত হওয়া মাত্র তেমনি করিয়া অস্থি * মধ্যস্থিত গাঢ় বীর্য্য অগ্নিতপ্ত ঘৃতের

* "অস্থি" বলিতে এখানে অণ্ডাস্থি বা অণ্ডকোষ বোঝাই সঙ্গত। কামচিন্তামাত্র রক্তস্রোত অণ্ডমধ্যে প্রবেশ করে এবং অণ্ডকোষ রক্ত হইতে শুক্র পৃথক্ করিয়া সূক্ষ্ম নালিকাদ্বারা শুক্রকোষে আনিয়া ব্যয়ের জন্য সঞ্চিত করে।

মত তরল হইয়া সূক্ষ্ম ছিদ্রপথে বহির্গত হইয়া যায় এবং জনন-কোষে আসিয়া পতিত হয়। এইরূপ স্বস্থানভ্রষ্ট বীর্য্যকণা-সমূহ জননকোষে আসিয়া সঞ্চিত হইলে যখন স্থানাভাব বা অস্বাভাবিক উত্তেজনাবশতঃ উহাতে তাহাদের আর স্থান সঙ্কুলান হয় না, তখন একদিন নিশাযোগে অতর্কিত অবস্থায় উহারা দেহ হইতে বাহির হইয়া দেহধারীকে অবসাদগ্রস্ত ও হতাশ করিয়া দেয়। স্বপ্নস্খলন একদিনের বা একবারের কামচিন্তায় হয় না, বহুবার অল্প অল্প করিয়া অজ্ঞাতসারে বীর্য্যের যে স্বস্থানচ্যুতি ঘটে, স্বপ্নস্খলন তাহাদেরই একত্রিত মূর্ত্তিমাত্র। প্রকাশ্যভাবে স্খলনটুকু হইবার অনেক পূর্ব্বেই তুমি দুর্ব্বল হইয়াছিলে, প্রকাশ্য ভাবে বীর্য্যপাত হইবার অনেক পূর্ব্বেই তুমি ব্রহ্মচর্য্যব্রত হইতে স্খলিত হইয়াছিলে। চিরদিন তুমি যেরূপ চিন্তা করিতে ভালবাসিতে, নূতন জীবন যাপনের সঙ্কল্প গ্রহণের পরেও মনের স্বাভাবিক প্রবণতাহেতু মাঝে মাঝে মন সেরূপ অসংযত পথে চলে বলিয়াই তোমার এই অকল্যাণ সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হইতেছে না। কিন্তু নিশ্চয় জানিও, মনকে শাসন করিতে করিতে, প্রবোধবাক্যে এবং রূঢ় ব্যবহারে চিত্তবৃত্তি সমূহকে ধীরে ধীরে আত্মবশে আনিবার সঙ্গেই এই অকল্যাণ দূরীভূত হইতে থাকিবে। মনকে যতই স্ববশ করিতে পারিবে, এই অকল্যাণ ততই তোমার কাছে ঘেঁষিতে ভয় পাইতে থাকিবে। মনকে শাসন করিবার যত প্রকার পন্থা

প্রাচীন মহর্ষিগণ প্রদর্শন করিয়াছেন, যোগ, ধ্যান, আসন, প্রাণায়াম প্রভৃতি যত প্রকার উপায় দেহকে স্থির ও চিত্তকে ভগবদনুরক্ত করিতে আবিষ্কৃত হইয়াছে, সকলই তোমাকে উচ্চতর কল্যাণসোপানে আরোহণের সঙ্গে সঙ্গে সুপ্তি-স্খলনের অকল্যাণ হইতে রক্ষা করিবে। অতএব আর অবসাদে বিমনায়মান রহিও না, হতাশায় আত্মহারা হইও না,—নবীন উৎসাহে, এক পা, এক পা করিয়া অগ্রসর হও। দৃঢ় সঙ্কল্পে নির্ভর করিয়া, অটুট অধ্যবসায়ের সহায় লইয়া পথ চলিতে আরম্ভ করিলে দীর্ঘতম পথও অতিক্রান্ত হইবে। মানুষ হইবার জন্য জ্বলন্ত আগ্রহ লইয়া ঝাঁপাইয়া পড়িলে এবং ভগবদ্বিশ্বাসরূপ মহাশক্তিতে শক্তিমান্ হইয়া বাহু-ক্ষেপনী চালনা করিলে অকূল সমুদ্রেরও পরপারে পৌছিতে পারিবে। তুচ্ছ কর্ত্তব্যটীর মধ্যে ভাগবতী বুদ্ধি লইয়া মনোনিবেশ কর, ছেঁড়া কাঁথাটী সেলাইবার সময় ইহার মধ্যে ভগবানের লীলা দেখিবার জন্য মনকে প্রেরণ কর, গাছ হইতে ফলটী পাড়িবার সময়ে, বীজরোপণ হইতে আরম্ভ করিয়া পরার্থে ফলদান পর্য্যন্ত বৃক্ষঘটিত যাবতীয় কার্য্যগুলি এবং তৎসন্নিহিত ভাগবৎ বিধান প্রত্যক্ষ করিবার জন্য মনকে নিয়োজিত কর। হাট-বাজার করিতে গিয়া কোন্ ভাগবতী প্রকৃতির অভিব্যক্তি দিবার জন্য জনবিরল অশ্বত্থ-বটের তলায় চারিদিকের বিক্ষিপ্ত মানুষগুলি একই স্থানে আসিয়া মিলিয়াছে, আবার সাময়িক

প্রয়োজনের বুঝ বুঝিয়া চারিদিকে সরিয়া পড়িবে, আজ যাহারা আসিয়াছে, কাল হয়ত তাহারা আসিবে না, আজ যাহাদের চরণের চিহ্ন এই মাটির জগতের উপর এখনও পড়ে নাই, কাল হয়ত তাহারাই আসিবে,—এইরূপ অসংখ্য নির্দ্দোষ কৌতুকবহুল ভাবের মধ্যে তোমার কোলাহল-পরায়ণ চিত্ত-বৃত্তিগুলিকে ফেলিয়া দাও,—এইভাবে প্রতিকার্য্যে প্রতি-পদক্ষেপে ভগবানের লীলার বিকাশ তোমার নিজ জীবন ও বাহিরের শত শত অবস্থার মধ্য দিয়া দেখিতে প্রয়াসশীল হও। একদিন দেখিবে, দৈহিক অকল্যাণ, মানসিক অকল্যাণ প্রভৃতি সবই একমাত্র পরম-প্রেমামৃত-পারাবারের আনন্দরস-তরঙ্গের তলে ডুবিয়া গিয়াছে। তখন দেখিবে, তোমার মুক্তি, বিশ্বজগতের মুক্তিকে সাথী করিয়া লইয়াছে, তোমার সাধনা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সাধনাপুঞ্জের সাথে তালে তালে নৃত্য করিয়া চরম চরিতার্থতা লাভ করিয়াছে।

আপ্রাণ-প্রয়াস-পরায়ণ হও, চেষ্টার অসাধ্য কিছুই নাই। তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বীর্য্যবিন্দুসমূহ দেহভ্রষ্ট হইয়া গিয়াছে বলিয়া শোক করিও না, শোক কাপুরুষের অবলম্বন, শোক তোমার সাজে না। জগতের মহৎ কল্যাণে আত্মজীবন বিসর্জ্জন দিয়া তোমাকে জগতের বুকে পদাঙ্ক রাখিয়া যাইতে হইবে, শতকোটি ব্যথিতের ব্যথা বিদূরিত করিয়া সকলের মুখে সুখের হাসি ফুটাইতে গিয়া, যদি প্রয়োজন হয়, তিল তিল

করিয়া তোমাকে দুঃখের অনলে দগ্ধ হইতে হইবে,—তোমাতে কি শোক সাজে ধন ? তুমি ক্ষীণই হও, আর সুস্থই হও, দুর্ব্বলই হও আর সক্ষমই হও যে-কোনও অবস্থায়, যে-কোনও পারিপার্শ্বিকের মধ্যেই তোমাকে আত্মবিকাশ করিতে হইবে। অজ্ঞাত বীর্য্যক্ষয় হইয়াছে বলিয়া বিমর্ষ হইয়া বসিয়া থাকিবে কেন ? যে গিয়াছে, সে যাইবার জন্যই ছিল, তোমাকে ছাড়িয়া গিয়াও সে ভগবানের ইচ্ছার ইঙ্গিত মানিয়াছে। যেটুকু ক্ষয় হইয়াছে হউক, তার জন্য অনুশোচনা করিও না. কিন্তু সাবধান, ভবিষ্যতে যেন আর বিন্দুমাত্রও বীর্য্য স্থানভ্রষ্ট না হইতে পারে, সেইদিকে সতর্ক লক্ষ্য রাখ। তোমার দেহ আর তুমি এক নহ। জগতের কল্যাণের জন্য তোমার দেহকে তুমি যন্ত্রস্বরূপ ব্যবহার করিতেছ মাত্র। এই যন্ত্র যাহাতে কাজের সময়ে কাজে আসে, প্রয়োজনের সময়ে যাহাতে মরিচা ধরিয়া কলকব্জা "আর্" না হইয়া যায়, সেইজন্য প্রতি বিন্দুর কোটিতম ভগ্নাংশটুকুও তোমাকে অশেষ যত্নে ও সতর্কতার সহিত সঞ্চয় করিতে হইবে। তাহা যদি না কর, তবে এই দেহযন্ত্রের মধ্য দিয়া তোমার কল্যাণ-কর্ম্মৈষণা উপযুক্ত বহির্বিকাশ পাইয়া উঠিবে না। তাই তুমি প্রাণবায়ু নিয়মিত করিয়া, দৃষ্টি একমাত্র ভ্রূ-লক্ষ্যে রাখিয়া প্রতিমুহূর্ত্তে প্রতিজ্ঞা করিতে থাক,—"মরি আর বাঁচি, আর বীর্য্যক্ষয় হইতে দিব না। প্রাণ যাউক আর থাকুক, হতাশ হইব না,

অবশ হইব না, বীর্য্যরক্ষণে তৎপর এবং জগৎকল্যাণে উৎসর্গীকৃত-সর্ব্বস্ব হইবই,—হইবই,—হইবই।" দেখিবে, তোমার সঙ্কল্পের অশনি-আঘাতে পূর্ব্বকৃত কর্ম্মের পর্ব্বত-শৃঙ্গসমূহ খণ্ড খণ্ড হইয়া চূর্ণিত হইয়া যাইবে। প্রত্যেকটী শোণিত-স্পন্দনে আজ শুধু ধ্বনিত হউক,—

"মন্ত্রের সাধন
কিম্বা
শরীর পতন"

—শ্রীশ্রীস্বরূপানন্দ—

(সমাপ্ত)

সূচীপত্র

অখণ্ড-সঙ্গীত

খণ্ড আজিকে হোক্ অখণ্ড
অণু-পরমাণু মিলিত হোক্,
ব্যথিত পতিত দুঃখী-দীনেরা
ভুলুক বেদনা, ভুলুক শোক ॥

ছোটবড় সব এক হ'য়ে যাক্,
প্রাণে প্রাণে হোক্ নব অনুরাগ,
জীবে জীবে হোক্ প্রেম-বন্ধন,
সৃষ্ট হোক্ আনন্দ-লোক ॥

দূরে থাকা আর চলিবে না,
জগতের কাছে আছে দেনা,
জনমে জনমে প্রাণ-বলি দিয়া
ফুটুক নয়নে বিমলালোক ॥

অপগত হোক্ আত্ম-কলহ,
স্বার্থ-প্রসূত দুঃখ-নিবহ
শরণ্য হোক্ ত্যাগের মন্ত্র,
ত্যাগই অমৃত, নহেক ভোগ ॥

—শ্রীশ্রীস্বরূপানন্দ—